NEHRU BAL PUSTAKALAYA

নেহরু বাল পুস্তকালয়

বীর কাহিনী



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

First Edition 1973 (*Saka* 1894)
Reprinted 1979 (*Saka* 1901)
Reprinted 1983 (*Saka* 1905)
Reprinted 1985 (*Saka* 1906)

National Book Trust, India
REVISED PRICE Rs.5.00

Stories of Valour (*Bengali*)

Published by the Director, National Book Trust, India, A-5 Green Park, New Delhi-110016 and printed at Saraswati Art Printers, 8247/2 New Anaj Mandi, Delhi-110006

নেহরু বাল পুস্তকালয়—16

বীর কাহিনী

রাজেন্দ্র অবস্তি

অনুবাদ : মহাশ্বেতা দেবী

চিত্রাঙ্কণ : শরদিন্দু সেন রায়



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

নয়াদিল্লি

শ্রবণকুমার



রাত হল। শ্রবণকুমার অন্ধ বাপ-মাকে খাওয়াল, যত্ন করে বিছানা পেতে দিল। ওঁরা যখন শুলেন তখন শ্রবণকুমার বাবার পা টিপতে লাগল। এ একেবারে ওর প্রতিদিনের নিয়ম। এ কথা ও কথা বলতে বলতে শ্রবণ বলতে লাগল, 'দক্ষিণ ভারত থেকে কজনা যাত্রী এলেন আজ, জানেন বাবা? ওঁরা তীর্থ করতে বেরিয়েছেন। আজকের দিনটা আমাদের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কি চমৎকার কীর্ত্তন যে গাইছিলেন কি বলি! কজন যাত্রী ত দেখলাম খোঁড়া আর পঙ্গু।'

বাপ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওঁদের ভাগ্য কত ভাল। আমারও ত তীর্থ করার কত ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ভগবান যে চোখ দুটি কেড়ে নিলেন।'

মা বলে উঠলেন, 'ও কি কথা? আমার চোখ না থাক, ছেলে ত আছে। ওই আমার চোখ। ভগবানকে দোষ দিচ্ছ কেন? বরঞ্চ বল এমন ছেলে পেয়েছি, আমরা কি কম ভাগ্যবান?'

শ্রবণ কোন কথাটি বলল না। কিন্তু বাবার কথাগুলো ওর মনে লেগে রইল। ও তখনি ঠিক করে ফেললে যে ও বাপ-মাকে তীর্থ করাবেই করাবে। এটুকু ওকে করতেই হবে। তবে মনের কথা মনেই রেখে দিল শ্রবণ। স্ত্রীকেও কিছু বলল না। শ্রবণ জানত ওর স্ত্রীর এসব কথাবার্তা মোটে ভাল লাগবে না।

তখনকার রীতিই ছিল ওরকম। শ্রবণ যখন ছোটটি, তখনি ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। শ্রবণ স্ত্রীকে বলত, 'দেখ, তুমি যদি আমায় সুখী করতে চাও, তবে প্রাণ দিয়ে আমার বাবা মার সেবা করো।'

শ্রবণ যখন সামনে থাকত, বউ শ্বশুর-শাশুড়িকে খুব সেবাযত্ন করত বটে। কিন্তু শ্রবণের আড়ালে ওঁদের কটকট করে কথা শোনাত। পেট ভরে খেতে পর্যন্ত দিত না। তবে শ্রবণের বাবা-মা ছেলের কাছে একটা নালিশও জানান নি কোনদিন, বরঞ্চ বউকে প্রশংসাই করতেন।

শ্রবণের মাথায় ত বাবা-মাকে তীর্থ করাবার চিন্তা ঢুকে গেল। শ্রবণ ভাবতে লাগল আহা, যাওয়ার ব্যবস্থা সব ঠিক করে যখন ওঁদের জানাব না জানি কত আহ্লাদ হবে। আবার শ্রবণের কষ্ট হবে ভেবে ওঁরা নিশ্চয়



বলবেন গিয়ে কাজ নেই। শ্রবণ তখন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওঁদের রাজি করাবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে শ্রবণ নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেল। সবসময়ে শুধু তীর্থের কথাই ভাবতে লাগল। ওঁর চিন্তা হল পথে মা-বাবার খুব কষ্ট হবে না ত? অনেক ভেবেচিন্তে শ্রবণ মনে মনে একটা বুদ্ধি ঠাওরাল।

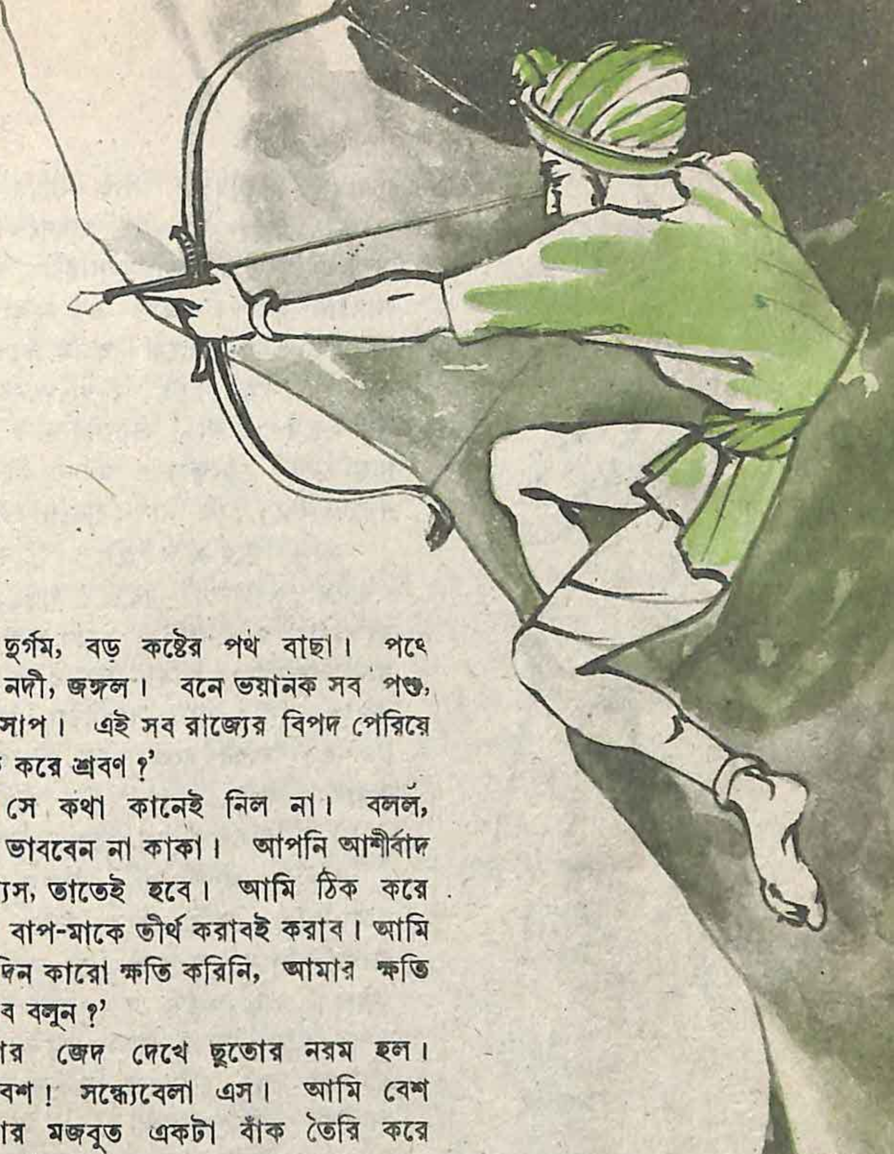
পরদিন সব কাজকর্ম সেরে শ্রবণকুমার ছুতোরের বাড়ি গেল। ছুতোর কাছেই থাকে। শ্রবণকে দেখে ত ছুতোর খুব খুশি। শ্রবণ বাবা-মাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে বলে গ্রামের সবাই ওকে খুব ভালবাসে।

ছুতোর বলল, 'বল বাবা, কেন এঁসেছ?'

শ্রবণ বলল, 'ছুতোর কাকা, আমাকে একটা বেশ ভাল দেখে বাঁক তৈরি করে দেবেন?' ছুতোর ত অবাক। 'বাঁক! বাঁক দিয়ে তুমি কি করবে?'

শ্রবণ বলল, 'মা বাবাকে বাঁকে বসাব। কাঁধে সেই বাঁক নিয়ে ওঁদের তীর্থে নিয়ে যাব কাকা। আহা, তীর্থে যাবার বড় সাধ ওঁদের। চোখ নেই, তাই ওঁদের বড় দুঃখ। তা কবে নাগাদ বাঁকটা দেবেন কাকা?'

ছুতোর শ্রবণের দিকে হাঁ করে চেয়েছিল। ও বলল 'বাবা শ্রবণ! আমার কথা শোন। তুমি ত ছোট ছেলে, এখনো বড় হওনি। তীর্থের



পথ বড় দুর্গম, বড় কষ্টের পথ বাছা। পথে পাহাড়, নদী, জঙ্গল। বনে ভয়ানক সব পশু, বড় বড় সাপ। এই সব রাজ্যের বিপদ পেরিয়ে যাবে কি করে শ্রবণ?'

শ্রবণ সে কথা কানেই নিল না। বলল, 'আপনি ভাববেন না কাকা। আপনি আশীর্বাদ করুন, ব্যস, তাতেই হবে। আমি ঠিক করে ফেলেছি বাপ-মাকে তীর্থ করাবই করাব। আমি কোনোদিন কারো ক্ষতি করিনি, আমার ক্ষতি কে করবে বলুন?'

শ্রবণের জেদ দেখে ছুতোর নরম হল। বলল, 'বেশ! সন্ধ্যেবেলা এস। আমি বেশ ভাল আর মজবুত একটা বাঁক তৈরি করে রাখবখ'ন।'

ছুতোরের বাড়ি থেকে বেরিয়েই শ্রবণ তীর্থে যাবার তোড়জোড় করতে লাগল। সারাদিন কাজকর্ম করে সন্ধ্যেবেলা আবার ছুতোরের বাড়ি



গেল। ছুতোর ত বাঁক তৈরি করেই রেখেছে, তবু, বাঁকটা শ্রবণকে দিতে দিতেও ছুতোর আরেকবারটি শ্রবণকে সাবধান করল। শ্রবণ ওর কথা কানে নিল না। বাবা-মাকে কেমন করে তীর্থ করাবে, কেমন করে ওঁদের মনের ইচ্ছে পূর্ণ করবে—এ ছাড়া শ্রবণের আর দ্বিতীয় চিন্তা নেই। ছুতোরকে প্রণাম করে শ্রবণ বাঁকটা কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল।

বাড়ি গিয়ে শ্রবণ স্ত্রীকে জানাল যে পরদিন খুব ভোরেই বেরিয়ে পড়তে হবে। মা-বাবাকেও জানাল। বুড়ো বাপ-মা কত মানা করলেন। আহা, তাঁদের ছেলে এত কষ্ট করে বাপ-মাকে বয়ে নিয়ে যাবে, তা কি হয়! শ্রবণ বলে কয়ে ওঁদের রাজি করাল। বলল, 'পথে কোন কষ্টই হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করেছি।'

পরদিন শ্রবণ খুব ভোরে উঠল। বাবা-মাকে তৈরি করে বাঁকে বসাল। তারপর কাঁধে বাঁক তুলে নিয়ে চলতে শুরু করল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখবার জন্যে সারা গ্রাম ভেঙে পড়ল পথে। সবাই চোখের জল ফেলতে ফেলতে শ্রবণকে আশীর্বাদ করতে লাগল।

শ্রবণ পথ চলছে, এদিকে বেলা বাড়ছে। পথে রথ চলতে শুরু করেছে। চারদিকে মানুষজনের যাওয়া আসা। শ্রবণের চোখে কিছুই যেন পড়ছেনা। কোনদিকে না চেয়ে শ্রবণ একমনে পথ ধরে চলেছে। যে ওকে দেখে সেই দুদণ্ড দাঁড়ায়।

একে একেবারে বালক বললেও হয়। এ কিনা অন্ধ মা-বাবাকে বাঁকে বসিয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে? যে দেখে তারই চোখ জলে ভরে ওঠে।

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়। শ্রবণ সারারাত বিশ্রাম করে আর সারাদিন পথ চলে। যেতে যেতে ও পৌঁছল এক ঘোর জঙ্গলে। জঙ্গল দেখে এতটুকু ভয় পেল না শ্রবণ, বরঞ্চ ওর খুব ভালোই লাগল।

কোথাও পাখির কিচমিচ কলকাকলী শোনা যায়, সিংহ গর্জে ওঠে। ভয়ে হরিণের পাল ছুটে পালায়। কোথাও দেখা যায় খরগোশের পাল এ ওকে তাড়া করছে। সিংহ যখন ডাকে, মনে হয় মা গো! বুঝি ভূমিকম্প হচ্ছে। শ্রবণ কিন্তু সিংহের ডাকেও ভয় পেল না। কাঁধে বাঁক নিয়ে ও যেমন চলছিল, তেমনি চলতে থাকল।

রাত হল। জঙ্গল ক্রমে নিশুত, নিঝুম হয়ে এল। সারাদিন ছুটোছুটির পর পশু, পাখি, সব নিজের নিজের জায়গাটিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু শ্রবণের চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে শ্রবণ ভাবছে ত ভাবছেই। বাঁকটি পাশেই নামানো। কাছেই মা-বাবা শুয়ে আছেন।

হঠাৎ বাবা শ্রবণের কাছে জল খেতে চাইলেন। শ্রবণ তাড়াতাড়ি মাটির কলসী তুলে নিয়ে দেখে যে তাতে এক ফোঁটা জল নেই। শ্রবণ বলল, 'বাবা, কলসীতে ত জল নেই। আমি এখনি জল নিয়ে আসছি। আশপাশে নিশ্চয় কোন পুকুর বা নদী আছে।'



বাবা অন্ধকারে যেতে কত মানা করলেন, কিন্তু শ্রবণ কি বাবার তেষ্টা পেয়েছে জেনে চুপ করে থাকতে পারে? কলসী নিয়ে শ্রবণ জলের খোঁজে চলল।

কিছুক্ষণ বাদেই ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে যেন শরীর জুড়িয়ে গেল। শ্রবণ বুঝল নিশ্চয় কাছেই কোন নদী বা সরোবর আছে। একটু এগোতেই নদীর কলকল শব্দ কানে এল। শ্রবণ ছুটে গিয়ে জলে কলসী ডোবাল। খালি কলসীতে জল ভরবার সময়ে যেমন হয়, বগবগ শব্দ হতে লাগল। এমন সময়ে কে জানে কোথা থেকে সোঁ করে বাতাস চিরে একটি তীর ছুটে এল, শ্রবণের বুকে বিঁধে গেল। শ্রবণের করুণ আর্তনাদে সমস্ত জঙ্গল যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। গাছের ওপর পাখ পাখালি বাসায় ঘুমিয়েছিল। তারা ডানা ঝাপটে জেগে উঠল। রাজা দশরথের কানেও সে আর্তনাদ পৌছল। তিনি গাছের ওপর বসেছিলেন। তীর তিনিই ছুঁড়েছিলেন।

হাতি শিকার করতে এসেছিলেন দশরথ। খালি কলসীতে জল ভরবার বগবগ শব্দ শুনে ভাবলেন বুঝি নদীতে জল খেতে এসেছে হাতি। অমনি কিছু না ভেবেই তীর ছুঁড়লেন।

আর্তনাদ শুনে দশরথ ত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ যে মানুষের চিৎকার! গাছ থেকে নেমে রাজা যেদিক থেকে চিৎকার আসছে সেদিকে ছুটলেন। দেখলেন এক সুন্দর কিশোর মাটিতে পড়ে নিশ্বাসের জন্যে খাবি খাচ্ছে। বুকে তীর বিঁধে আছে। হায়! হাতি ভেবে মারলেন যাকে সে এই সুকুমার কিশোর! দশরথের অনুতাপের আর সীমা-পরিসীমা রইল না। চোখের সামনে মাটি যেন দুলে উঠল।

শ্রবণ মা-বাবাকে ডাকছিল। দশরথ শ্রবণের পাশে বসলেন। কোলে ওর মাথা তুলে নিলেন, সন্তর্পণে তীর তুলে নিলেন ওর বুক থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। দশরথের চোখে জল ভরে এল। বললেন, 'হে কিশোর বালক! অজানতে বড় পাপ করে ফেলেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি ভেবেছিলাম নদীতে হাতি জল খেতে এসেছে।'

বড় কষ্ট করে, অনেক চেষ্টায় শ্রবণ বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি কোন

রাজা হবেন। আমার একটি কাজ করে দিন। এই বনেই ওদিকে আমার মা আর বাবা বসে আছেন। আমি ওদের জন্যে জল নিতে এসেছিলাম। তেষ্টায় ওঁদের বড় কষ্ট হচ্ছে। আপনি তাড়াতাড়ি জল নিয়ে গিয়ে ওঁদের দিন।'

ধীরে ধীরে শ্রবণ রাজাকে সব কথাই বলল। 'এমন বিনয়ী, এমন পিতৃমাতৃ ভক্ত কিশোরের মরণ আমার হাতেই ঘটল?' এ কথা বলে রাজা দশরথ কাঁদতে কাঁদতে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন।

শ্রবণ বলল; 'রাজা! আর দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি জল নিয়ে যান।'

বলতে বলতে শ্রবণ শেষনিশ্বাস ত্যাগ করল।

দশরথ শ্রবণের মা-বাবার খোঁজে চললেন।

দূর থেকে দেখলেন একটি গাছের নিচে কারা যেন বসে আছেন। সেদিকেই চললেন দশরথ। তাঁর পায়ের শব্দ শুনেই শ্রবণের মা-বাবা একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'এসেছ বাছা? এত দেরি হল! আমরা ত ভয় পেয়েছিলাম বুঝি তোমারই কিছু বিপদ হল। তাড়াতাড়ি জল দাও বাছা! তেষ্টা আর সইতে পারছি না।'

দশরথের বুক ধরাস করে উঠল, মাথা লজ্জায় ধিক্কারে নুয়ে পড়ল। কেমন করে ওদের ছেলের মৃত্যুসংবাদ দেবেন? শ্রবণের বাবার হাতে জলের কলসী দিলেন দশরথ, হাত কাঁপতে লাগল। কলসী নিতে নিতে বাবা বললেন, 'কথা কইছ না কেন বাছা? কি হয়েছে তোমার?' তারপর সহসা সন্দেহে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি শ্রবণ ত? না অন্য কেউ?'

মা বললেন, 'কথা বলছ না কেন বাছা? তুমি ত দূর থেকেই মা মা বলে ডাকতে ডাকতে আস? আজ কি হল তোমার? তুমি কথা না বললে আমি জল খাব না।'

এখন দশরথ কি করেন? অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হতে দশরথ বললেন, 'মা! আমিও তোমার এক ছেলে। আমার নাম দশরথ। তোমার শ্রবণ......' বলতে বলতে রাজার গলা কেঁপে গেল।

মা চিৎকার করে উঠলেন, 'বল, বল, আমার শ্রবণের কি হয়েছে?'

রাজা বুকে সাহস বেঁধে অনেক কষ্টে শ্রবণের মৃত্যুর কথা বললেন।

মা বাবা আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁদের বিলাপে সমস্ত জঙ্গল যেন কেঁপে উঠল। অযোধ্যায় মহাপ্রতাপ রাজা দশরথ অপরাধীর মত মাথাটি নুইয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেমন করে ওঁদের সান্ত্বনা দেবেন কিছুতে ভেবে পেলেন না। রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'মা! তোমরা দুজন আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাদের সেবা করব। আজ থেকে আমিই তোমাদের শ্রবণ।'

ওঁরা কি সে কথা শুনলেন! বললেন, 'শ্রবণ ছাড়া আমাদের জীবনই বৃথা। রাজা! নিজের ছেলের বিয়োগ ব্যথায় যেদিন কষ্ট পাবে সেদিন তুমি আমাদের ব্যথা বুঝবে।'

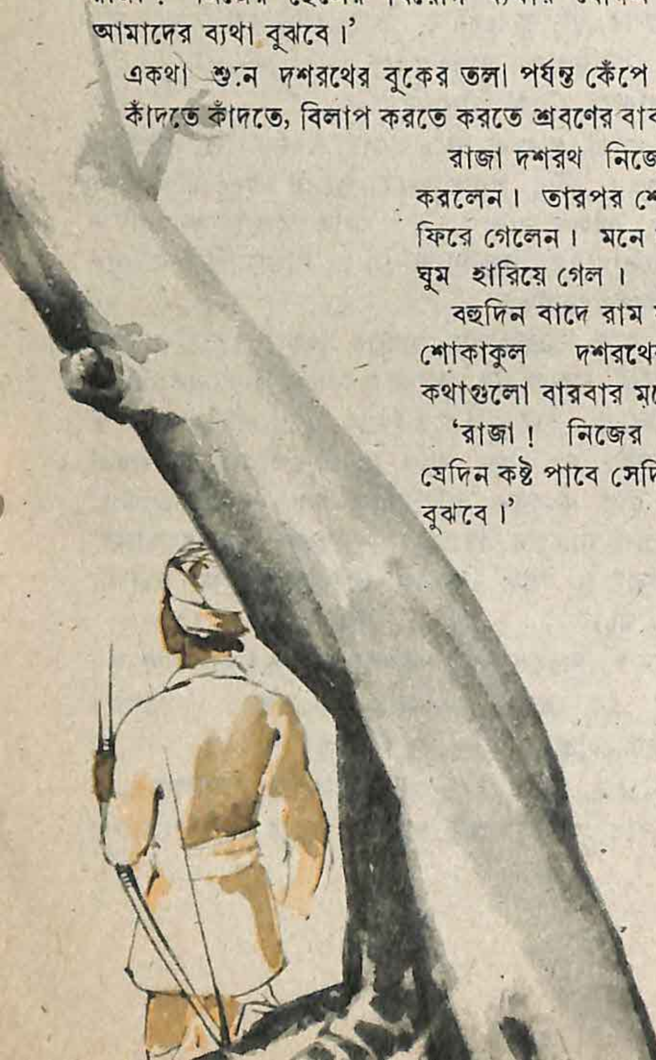
একথা শুনে দশরথের বুকের তলা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

কাঁদতে কাঁদতে, বিলাপ করতে করতে শ্রবণের বাবা-মা প্রাণত্যাগ করলেন।

রাজা দশরথ নিজের হাতে ওঁদের সৎকার করলেন। তারপর শোকাকুল হয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। মনে শান্তি রইল না, চোখের ঘুম হারিয়ে গেল।

বহুদিন বাদে রাম যখন বনবাসে চলে যান, শোকাকুল দশরথের শ্রবণের মা-বাবার কথাগুলো বারবার মনে পড়ত।

'রাজা! নিজের ছেলের বিয়োগ ব্যথায় যেদিন কষ্ট পাবে সেদিন তুমি আমাদের ব্যথা বুঝবে।'



গুরু দক্ষিণা

সে অনেকদিনের কথা। হিরণ্যধনু ছিলেন ভীলদের রাজা। যেমন প্রতাপশালী, তেমনি বীর। বড় বড় ক্ষত্রিয় রাজারাও ওকে সমীহ করে চলতেন।

একলব্য হিরণ্যধনুরই একমাত্র ছেলে। একলব্য ঠিক ওর বাবারই মত—যেমন সাহসী তেমন পরিশ্রমী। যে কাজটি ধরে সেটি শেষ করে তবে ছাড়ে।







একদিন একলব্য একলা জঙ্গলে ঘুরছে এমন সময় চোখে পড়ল এক রাজপুত্র শিকার করছেন। একলব্য মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগল আর ভাবতে লাগল। 'যদি অমনি তীর ছুঁড়তে পারি, লক্ষ্য বিধঁতে পারি কি ভালোই হয়। তাহলে শিকারে আমার জুড়ি কেউ থাকবে না।'

একলব্য রাজপুত্রের কাছে গিয়ে বলল, 'কুমার তুমি কার কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখেছ, তোমার গুরু কে?'

যেন ধ্যান ভেঙে গেল রাজকুমারের। একটু রেগে একলব্যের দিকে চাইলেন। রুক্ষ স্বরে বললেন 'গুরু দ্রোণাচার্য।' তারপর মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। রাজকুমারের অহংকার একলব্যের মোটেই ভাল লাগল না, তবে এ নিয়ে ও বিশেষ মাথা ঘামাল না। ওর মন তখন অন্য দিকে। একলব্য ভাবতে লাগল গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে যদি শিখতে পারে তাহলে সেও ওই রাজপুত্রের মত এক কুশলী ধনুর্ধর হয়ে উঠবে।

বাড়ি ফিরেই একলব্য গুরু দ্রোণাচার্যের কথা জানতে চাইল। হিরণ্যধনু একলব্যকে বললেন, দ্রোণ রাজধানীতে থাকেন আর মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের কুমারদের ধনুর্বিদ্যা শেখান। হিরণ্যধনু বললেন 'একলব্য, দ্রোণাচার্যের তুল্য ধনুর্বিদ পৃথিবীতে দুটি নেই।'

বাবার কথা শুনে একলব্যের মন উৎসাহে ভরে গেল। বালক বলল 'বাবা, আমিও আচার্য দ্রোণের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখব।'

হিরণ্যধনু একটু ঘাবড়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন তা ত সম্ভব হবে না। আচার্য দ্রোণ এক ভীল বালককে কিছুতে ধনুর্বিদ্যা শেখাবেন না। একলব্যকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বললেন, 'বাছা, এ কথা ভুলে যাও। দ্রোণ কখনো তোমাকে নিজের শিষ্য করবেন না।'

'কেন?' একলব্য অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

‘বাছা! তুমি ক্ষত্রিয় নও যে! দ্রোণাচার্য শুধু ক্ষত্রিয়দের, বিশেষ করে ক্ষত্রিয় রাজপুত্রদের ধনুর্বিদ্যা শেখান। কিন্তু তাতে কি হয়েছে বল। আমি তোমায় ধনুর্বিদ্যা শেখার ব্যবস্থা করে দেব।’

একলব্য অমনি বলে উঠল, ‘না বাবা! ধনুর্বিদ্যা শিখতে হয় ত দ্রোণাচার্যের কাছেই শিখব। আপনি আমায় অনুমতি দিন।’

হিরণ্যধনু ত ছেলের স্বভাব ভাল করেই জানেন। ও যা ঠিক করবে তা যে ছাড়বে না তাও জানেন। এই গুণটি ছেলের আছে বলে হিরণ্যধনু মনে মনে খুব প্রসন্ন। কোন কাজ সম্পূর্ণ করতে গেলে চেষ্টার ত্রুটি রাখতে নেই তা ত তিনি জানেন। হিরণ্যধনু একলব্যকে রাজধানী যাবার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

পরদিন একলব্য রাজধানীর দিকে রওনা হল। মনে কি আনন্দ, কি উৎসাহ। ও বুঝতেই পারল না কেমন করে এই দীর্ঘপথ নিমেষে শেষ হয়ে গেল। রাজধানী পৌঁছে, দ্রোণাচার্যের ঠিকানা একে-তাকে জিজ্ঞেস করতে করতে একলব্য তাঁর বাড়ীতে পৌঁছল।

দ্রোণাচার্য তাঁর কুটিরের ভেতর বসে রাজকুমারদের ধনুর্বিদ্যা বোঝাচ্ছিলেন। দরজায় শামলা ছেলেটিকে দেখে সবাই







চমকে উঠল। যে রাজকুমাররা কুটিরের ভেতরে বসেছিলেন তাঁরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। ভাবলেন প্রহরী এ ভীলবালককে বাধা দিতে পারলে না? কারো বা মনে হল একলব্য যেন কি রকম দেখতে! দ্রোণ বুঝলেন একলব্য অমন আচমকা এসে উপস্থিত হওয়াটা রাজকুমারদের ভালো লাগেনি। দ্রোণ মধুর স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে? এখানে কেন এসেছ? কি চাও?'

একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন শুনে একলব্য এতটুকু বিচলিত হল না। ধীরপদে এগিয়ে গিয়ে ও দ্রোণাচার্যের পায়ের ওপর মাথা রাখল। বলল, 'আচার্য! আমি ভীলরাজ হিরণ্যধনুর ছেলে। আমার নাম একলব্য। আপনার কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখব বলে এখানে এসেছি। দয়া করে আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন!'

একলব্যের মুখের কথা শেষ হতে পেল না। রাজকুমাররা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। একলব্য বুঝল ওঁরা ওকে নিয়েই হাসছেন। ওর মুখ রাগে থমথমে হয়ে উঠল। তবে একলব্য মুখে কথাটি বলল না। বড় আশায় ও দ্রোণের মুখের দিকে চেয়ে রইল। দ্রোণও গম্ভীর হয়ে একলব্যকে দেখতে থাকলেন। ওকে বুঝিয়ে বললেন, 'ভীলকুমার! আমি ত তোমাকে শিষ্য করতে পারব না। আমি শুধু ক্ষত্রিয়কুমারদেরই ধনুর্বিদ্যা শেখাই। যাও, ঘরে ফিরে যাও।'



একলব্যের মনে ভয় ছিল আচার্য দ্রোণ এই উত্তরই দেবেন। তবে ভরসা ছিল কোনমতে ওঁকে রাজি করাতে পারবে। বড় দুঃখে, ভগ্ন স্বরে বালক বলল, 'আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি আপনার কাছেই ধনুর্বিদ্যা শিখব। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হলে আমি ঘরে ফিরব না। দয়া করে আমায় আপনার শিষ্য করে নিন্।'

দ্রোণাচার্য তবু রাজি হলেন না। একলব্যের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন না।

বড় দুঃখে মন ভার করে একলব্য কুটির থেকে বাইরে এল। কি যে করে ও ভেবেই পেল না। হার মানতেও মন চাইছে না। ক্ষত্রিয় কুমারদের সে বিদ্রূপের হাসি ওর বুকে বিঁধে রয়েছে। একবার বাবার কথাগুলো মনে পড়ছে আবার নিজের প্রতিজ্ঞার কথা। কখন চোখের সামনে সেই ছবিটা ভাসছে, রাজকুমাররা ব্যঙ্গের হাসিতে ফেটে পড়ছে। সে সব কথা মনে হতেই একলব্য অস্থির হয়ে উঠল, হাত বারবার মুঠো করল। মনের গভীরে একটা সংকল্প স্থির করল।

দ্রোণের কুটির থেকে বেরোল একলব্য তবে ঘরে ফিরল না। ও গেল জঙ্গলে। মাটি দিয়ে ও আচার্য্য দ্রোণের একটা মূর্তি গড়ল। সে মূর্তির কাছেই নিজের কুটির বাঁধল। তারপর একলব্য সেখানেই বাস করতে লাগল আর একা একাই ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করতে লাগল। আকাশে আলো ফোটার আগে ও তীর ছুঁড়তে শুরু করে, মাঝ রাত অবধি তীর ছুঁড়ে চলে। কতবার সূর্য আর চাঁদ উদয় হল, অস্ত গেল। কত ঋতু এল গেল। দুর্দান্ত গ্রীষ্মে একলব্য এতটুকু বিচলিত হয় না, বসন্তকাল এলে এতটুকু চঞ্চল হয় না। অবশেষে এই কঠিন সাধনা, কঠোর পরিশ্রমের ফল মিলল। একলব্য এক মহাকুশলী ধনুর্ধর হয়ে উঠল।

একদিন গুরুর মাটির মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে একলব্য লক্ষ্য স্থির করছে। ধনুক একহাতে ধরে, বুড়ো আঙুলে কান পর্যন্ত জ্যা টেনেছে, হঠাৎ একটা কুকুর এসে ভৌ ভৌ করতে লাগল। কুকুরের চিৎকারে একলব্যের অভিনিবেশ ভেঙে যেতে লাগল। একলব্য কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল কিন্তু কুকুরটা কিছুতে সরতে চায় না। তখন একলব্য শব্দভেদী বাণ ছুঁড়ে কুকুরের মুখ এফোঁড়-ওফোঁড় সেলাই করে দিলে।

বাণবিদ্ধ কুকুর অস্থির হয়ে ছুটে চলে গেল। কৌরব-পাণ্ডব রাজপুত্রেরা বনে শিকার করতে এসেছেন, এ কুকুর তাঁদেরি। কুকুরের মুখে বাণ দেখে রাজপুত্রদের মাথা ঘুরে গেল। প্রথমে ত চোখকেই বিশ্বাস হতে চায় না। বোঝা গেল কোন মহাকুশলী ধনুর্ধর কুকুরের মুখ বাণ দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন।

কুমাররা ত অর্জুনকেই সবচেয়ে বড় ধনুর্বিদ বলে জানেন। এ তীর যিনি ছুঁড়েছেন তিনি অর্জুনের চেয়েও বড়। কুকুরটা নিয়ে কুমাররা দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন।

কুকুরের মুখে বাণ দেখে দ্রোণাচার্য বিস্ময়ে সচকিত হয়ে উঠলেন। অজ্ঞাত ধনুর্বিদকে মনে মনে প্রশংসা না করে পারলেন না। কি আশ্চর্য নিপুণতায় এই অজানা ধনুর্ধর কুকুরের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। রাজকুমারদের সঙ্গে দ্রোণাচার্য তার খোঁজে চললেন।

কিছুদূর যেতে না যেতেই একলব্যকে চোখে পড়ল। দ্রোণ তাকে চিনতে পারলেন। কাছে গিয়ে বড় স্নেহে বললেন, 'পুত্র! তুমি ত খুব ভাল ধর্নুর্ধর হয়েছ। তোমার গুরু কে?'

'আচার্য দ্রোণ!' একলব্য বিনম্র হয়ে বলল।

রাজপুত্রদের সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণও আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'আচার্য দ্রোণ?'

'হ্যাঁ, আচার্য দ্রোণ।'

একলব্য মূর্তির দিকে ইশারা করে দেখাল।

সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণাচার্যের সব কথা মনে পড়ে গেল। একলব্যের চেষ্টা দেখে দ্রোণ বড়ই প্রসন্ন হলেন। আজ পর্যন্ত এমন পরিশ্রমী, এমন অধ্যবসায়ী আর একটি কিশোর ওঁর চোখে পড়ে নি। এমন শিষ্যকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বলে মনে খুবই অনুতাপ হতে লাগল। তবু, অর্জুনকে যে কথা দিয়েছিলেন আজ তা মনে এল।

দ্রোণ অর্জুনকে কথা দিয়েছিলেন অর্জুনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর কেউ থাকবে না। কিন্তু একলব্যকে অর্জুনের চেয়েও বড় মনে হতে লাগল। দ্রোণের মহা চিন্তা হল কিন্তু ভাবতে ভাবতে একটা পথ যেন খুঁজে

পেলেন। কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থেকে একলব্যকে বললেন, 'পুত্র! তুমি আমায় গুরু বলে মেনেছ। আমি তোমার গুরু হলাম। তুমি আমাকে গুরুদক্ষিণা দেবে বল?'

একলব্য মাথা নুইয়ে বলল 'যা বলবেন, গুরুদেব।' সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণ বললেন, 'তবে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা আমায় দাও।'

এক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধতা নেমে এল। এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে একলব্য ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি কেটে দ্রোণকে দিলেন। দ্রোণ একলব্যের গুরুভক্তি দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। চোখে জল ছলছল করে উঠল।

ওঁর চোখের সামনে এই শ্যামল দেহ ভীল কিশোরের চেহারা এক অপূর্ব তেজে দীপ্ত হয়ে উঠল। দ্রোণ কৌরব-পাণ্ডব কুমারদের দিকে চেয়ে দেখলেন। সকলের চোখে বিস্ময়। দ্রোণের মনে হল ভীল একলব্য সব রাজপুত্রদের চেয়ে, এমন কি দ্রোণাচার্যের চেয়েও অনেক, অনেক বড়।







কৃষ্ণ ঃ জীবন প্রভাত

ভাদ্রমাসের অষ্টমী তিথি। মাঝরাত। আকাশ অন্ধকারের ঘেরাটোপে ঢাকা। হাতীর পালের মত পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ আকাশ ঢেকে ফেলেছে। মেঘ ডাকছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সারা পৃথিবী যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

মথুরা নগরীতে সবাই যে যার ঘরে। এ সময়ে কি ঘর থেকে কেউ বেরোয়? কিন্তু মথুরার রাজা কংসের চোখে ঘুম নেই। যেদিন থেকে

কংস জেনেছেন ছোটবোন দেবকীর সন্তানের হাতেই তাঁর মরণ লেখা, সেদিন থেকেই মনে সুখ নেই, চোখে ঘুম নেই।

দেবকী আর দেবকীর স্বামী বসুদেবকে কংস কারাগারে বন্দী করে রেখেছেন। কারাগারে দেবকীর সাতটি সন্তান হয়েছে। প্রত্যেকটি শিশুকে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই মেরে ফেলেছেন কংস। কোনরকম সুযোগ দেননি বিপদ ঘটবার। আজ দেবকীর অষ্টম সন্তান হবার কথা।

কংস বড় অত্যাচারী। নিজের বাবা উগ্রসেনকে বন্দী করে কংস রাজা হন। কতজনকে মেরেছেন কংস, কতজনকে কষ্ট দিয়েছেন, তা আর লেখাজোখা নেই। প্রজাদের মুখে এখন ত্রাহি ত্রাহি রব। কংসের দুশ্চিন্তার আর শেষ নেই। বোনের যে সন্তান হবে, সেই তাঁকে মারবে ত!

রাত বারোটার সময় রোহিণী নক্ষত্রে দেবকীর অষ্টম সন্তান কৃষ্ণের জন্ম হল। কালো ছেলেটির জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের আলোয় কারাগার ঝলমল করে উঠল। দেবকী আর বসুদেব দুজনেই বুঝলেন এ সামান্য ছেলে নয়। এর হাতেই কংসের মৃত্যু হবে।

ওঁরা আগেই ঠিক করে রেখেছেন যেমন করে হক এবার যে সন্তান জন্মাবে তাকে বাঁচাতেই হবে। বসুদেব একটা ছোট ঝুড়িতে ছেলেকে শোয়ালেন, দরজার কাছে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই দরজা খুলে গেল। দেখা গেল প্রহরী গভীর ঘুমে অচেতন। বসুদেব পা টিপে টিপে বেরোলেন। কেউ ওঁকে দেখতে পেল না।

বর্ষার অন্ধকার রাত। মথুরানগরী সুখের ঘুমে বিবশ হয়ে আছে। মাথায় ঝুড়িটি নিয়ে বসুদেব যমুনার ধারে পৌঁছলেন। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার যে নিজের হাতখানা অবধি চোখে পড়ে না। যমুনায় বান ডাকছে কিন্তু বসুদেব যেমন নদীর ধারে পৌঁছলেন সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল আপনা হতে নেমে গেল। নদী পেরিয়ে বসুদেব ওপারে গোকুলে পৌঁছলেন।



গোকুলে চারদিক নিশ্চুপ, নিঝ্‌ঝুম। একটি প্রাণীও জেগে নেই। বসুদেব মিতা নন্দের বাড়ি পৌঁছলেন। তখনি নন্দের স্ত্রী যশোদার একটি মেয়ে হয়েছে। নন্দ খাট থেকে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে ঝুড়িতে রাখলেন। ঝুড়ি থেকে শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে খাটে শুইয়ে দিলেন। তারপর বসুদেব পা টিপে টিপে ফিরে গেলেন। যমুনার জল তখনো শান্ত, যেন তাঁর প্রতীক্ষাতেই ছিল। বসুদেব নদী পেরিয়ে যেমন মথুরার মাটিতে পা রাখলেন অমনি নদীতে বন্যা এল।

এইসব আশ্চর্য ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে বসুদেব কারাগারে পৌঁছে গেলেন। কারাগারের দরজা তখনো খোলা। সান্ত্রী তেমনি ঘুমোচ্ছে। বসুদেব ভেতরে ঢুকতেই দরজা আপনা হতেই বন্ধ হয়ে গেল। কি ঘটে গেল কেউ জানতে পারল না।

দেবকীর কোলে গিয়েই মেয়ে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্রী জেগে উঠল। দেবকীর অষ্টম সন্তান জন্মেছে এ খবর কারাগারে ছড়িয়ে পড়ল।



একদল সৈন্য ছুটে গিয়ে রাজপ্রাসাদে কংসকে খবর দিল। কংস তখন শোবার ঘরে অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন। বারবার দরজার দিকে চেয়ে দেখছেন তাঁর হন্তারকের জন্মের খবর নিয়ে কেউ আসে কি না। তখন কয়েকজন সৈন্য হুড়মুড় করে এসে উপস্থিত হল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'অন্নদাতা মহারাজ! দেবী দেবকীর একটি মেয়ে হয়েছে।'

শুনেই কংস তরোয়াল নিয়ে খালি পায়েই কারাগারের দিকে দৌড়লেন। তাঁর সে উগ্র মূর্তি দেখে সান্ত্রী দরজা খুলে দিয়ে সরে গেল। কংস দেবকীর কোল থেকে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিলেন। একটা পাথরের ওপর তাকে আছড়াতে যাবেন, এমন সময় মেয়েটি ওঁর হাত ছাড়িয়ে আকাশের দিকে উঠে গেল। যেতে যেতে বলল, 'পাপী কংস! তোমাকে যে মারবে সে বেঁচে রইল।'

এ কথা শুনে কংস ক্রোধে কেঁপে উঠলেন। তিনি হুকুম দিলেন সে রাতে ব্রজভূমিতে যত শিশু জন্মেছে সবাইকে মেরে ফেলতে হবে। দিকে দিকে তিনি লোক পাঠিয়ে দিলেন। কয়েকজন স্ত্রীলোকও তাদের মধ্যে ছিল। একজনের নাম ছিল পূতনা।

কংসর ঘাতকরা ব্রজে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি নবজাত শিশুকে হত্যা করল। চারদিকে সবাই ভয়ে কাঁপতে লাগল।

পূতনা নানারকম রূপ ধরতে পারে। এক একদিন এক এক নতুন রূপ ধরে সে দিকে দিকে নির্দোষ শিশুদের হত্যা করে বেড়াতে লাগল।

একদিন ছদ্মবেশে পূতনা নন্দের বাড়ি গেল। সেদিন কৃষ্ণ জন্মের পর ছদিন হয়েছে। ষষ্ঠি পূজোর উৎসবের দিন। আদর করবার ছলে পূতনা কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিল তারপর বুকের দুধ খাওয়াতে লাগল। পূতনা ত সারা গায়ে বিষ মেখে এসেছে, ও ভাবল ওর দুধ খেলেই এ ছেলে মরে যাবে। কাজের বেলা কিন্তু উলটো হল। কৃষ্ণ এত জোরে দুধ টানলেন যে পূতনা চিৎকার করে উলটে পড়ে মরে গেল। মরবার সঙ্গে সঙ্গে ওর আসল বিকট চেহারা বেরিয়ে পড়ল।

পূতনার মৃত্যুর কথা জেনে কংস অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। পূতনার ওপর ওঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। কৃষ্ণকে মারবার জন্যে পূতনার ভাই বকাসুরকে

ব্রজে পাঠালেন কংস। তার অবস্থাও পূতনার মতই হল। তারপর বকাসুরের ভাই অঘাসুরকে পাঠালেন। বালক কৃষ্ণের হাতে তার প্রাণটাও গেল।

কংস ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। কৃষ্ণকে মারবার জন্যে নিত্যনতুন কৌশল ভাবেন। বারবার কংসের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে কৃষ্ণ একটু বড় হলেন। বাঁশি বাজান, অন্য গোপ বালকদের সঙ্গে গরু চরান আর এদিক সেদিক খেলা করে বেড়ান।

যমুনায় কালীয় নামে এক বিষাক্ত নাগ পরিবার নিয়ে বাস করত। তাই যমুনার জল বিষে নীল হয়ে গিয়েছিল। ফলে যমুনার তীরে যত গাছ, যত ফুল, সব শুকিয়ে মরে গিয়েছিল। গোপ বালকরা অথবা গাই গরু, যে যমুনার জল খেত সেই অসুস্থ হয়ে পড়ত। কৃষ্ণ যেই সে কথা জানতে পারলেন অমনি স্থির করলেন, বিষধর কালীয় নাগকে যমুনা থেকে তাড়াতে হবে।

একদিন কৃষ্ণ গোপ বালকদের সঙ্গে যমুনার তীরে গোলক গড়িয়ে গড়িয়ে খেলা করছেন, গোলকটি জলে পড়ে গেল। কৃষ্ণ অমনি খেলবার গোলকটি তুলবেন বলে জলে ঝাঁপ দিলেন। তাই দেখেই সঙ্গীরা এক-গলায় চেঁচিয়ে উঠল। ছেলেদের মা বাবা সবাই ছুটে এসে নদীর পাড়ে জড়ো হল। খবর পেয়ে নন্দ আর যশোদাও ছুটে এলেন। যখন ওঁরা দেখলেন কৃষ্ণ জলের নিচে তলিয়ে গেছেন, ভয়ে ওঁদের প্রাণটা যেন উড়ে গেল।

এদিকে কালীয় নাগ যখন কৃষ্ণকে দেখল তখন রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে কাছে এল। কৃষ্ণও সতর্ক ছিলেন। কালীয় যেই কাছে এল কৃষ্ণ ওর ফণার ওপর উঠে দাঁড়ালেন। কালীয়র ত একটা নয়, শত শত ফণা। কালীয় ফণা মেলে কৃষ্ণকে কামড়াতে চেষ্টা করতে লাগল। কৃষ্ণ মহানন্দে এক একটা ফণার ওপর ছোট ছোট পা দুখানি রাখেন আর নেচেকুঁদে ফনাটা পিষে ফেলে দেন। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কালীয় নাগ যমুনা থেকে মাথা তুলল।

সে এক দেখার মত দৃশ্য বটে! কালীয় নাগের শত শত ফণার ওপর

বালক কৃষ্ণ নাচছেন আর ছোট্ট বাঁশিটি বাজাচ্ছেন।
কৃষ্ণকে দেখে সমস্ত ব্রজবাসী মুগ্ধ। কালীয় নাগের অবস্থা তখন শোচনীয়। ফণা দিয়ে রক্ত পড়ছে। যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর ছটফট করছে। কালীয় নাগের যত স্ত্রী ছিল, তারা আর এ দুর্দশা দেখতে পারল না। হাত জোড় করে নাগপত্নীরা কৃষ্ণের স্তব করতে লাগল। কৃষ্ণের মনে





দয়া হল। কৃষ্ণ বললে, 'এক শর্তে কালীয়কে ছেড়ে দিতে পারি। কালীয় যদি এখনি যমুনা ছেড়ে রমণক দ্বীপে চলে যায় তবে ওকে ছেড়ে দেব।'



কালীয় কৃষ্ণের কথা মেনে নিল। সমস্ত নাগ পরিবার সঙ্গে নিয়ে কালীয় তখনি রমণক দ্বীপ রওনা হয়ে গেল। এই ঘটনার পর সবাই কালীয়র ভক্ত হয়ে গেল। এই বীরত্বের কাহিনীটি কালীয়দমন নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

কৃষ্ণের বাল্যকাল এমনি সব কাণ্ডকারখানায় ভরা। ভারি সাহসী ছিলেন কৃষ্ণ, ভয়ডর ছিল না। কৃষ্ণের বাঁশিতে যেন জাদু ছিল। বাঁশির সুর শুনলে গরু ঘাস খাওয়া ছেড়ে দিত। ব্রজের মেয়েরা সব কাজ ভুলে কৃষ্ণের কাছে এসে বসত। ওরা কৃষ্ণকে খুব ভালবাসত আবার কৌতুকও করত খুব। কখনো কৃষ্ণের বাঁশি লুকিয়ে রাখত। কখনো বা কৃষ্ণের মাথার চূড়া থেকে ময়ূরপুচ্ছটি নিয়ে লুকিয়ে রাখত। কৃষ্ণও ওদের কৌতুকের উত্তর কৌতুকেই দিতেন। কখনো ওদের মাখন চুরি করতেন, কখনো জলের কলসী ভেঙে দিতেন। এমনি করে ব্রজবাসীদের জীবন বড় আনন্দে কাটছিল।

একদিন কৃষ্ণ দেখলেন ব্রজে যেন কি উৎসবের তোড়জোড় চলেছে। নন্দকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন ব্রজে ইন্দ্রপূজার আয়োজন হচ্ছে। নন্দ বললেন, 'বাছা! ইন্দ্র হচ্ছেন মেঘের রাজা। ইন্দ্রই বৃষ্টি দেন। বৃষ্টি হয় বলেই খেতে ধান হয়। তাই আমরা প্রতি বছর যজ্ঞ করি আর ইন্দ্রকে অর্ঘ দিই।'

কৃষ্ণ ভাল বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'বাবা, মেঘের কাজই হল জল দেওয়া। তাতে ইন্দ্রের কি হাত আছে বল? ইন্দ্রের পূজো না করে আমাদের উচিত গোবর্ধন নামে যে পাহাড় আছে তারই পূজো করা। মেঘ যখন পাহাড়ের চূড়োয় এসে বাধা পায় তখনি ত বৃষ্টি হয়। এতে ইন্দ্রের করার কি আছে?'

সকলেরি কথাটা উচিত বলে মনে হল। সবাই মিলে ঠিক করল যে গিরি গোবর্ধনের পূজো করতে হবে। গোপ-বালকরা গিরি গোবর্ধনের পূজো ও পাহাড় ঘিরে পরিক্রমা করতে লাগল।

ইন্দ্রের কানে যখন খবর পৌঁছল ইন্দ্র বেজায় রেগে গেলেন। মুষলধারে বৃষ্টি ঢালতে লাগলেন। এত বৃষ্টি হল যে সারা ব্রজধাম ডুবে গেল। মানুষ হাহাকার করতে লাগল। সবাই কৃষ্ণের কাছে ছুটে এল। কৃষ্ণ যখন হাসতে হাসতে হাতের কড়ে আঙুলের ওপর পাহাড়টি তুলে নিলেন তখন আর মানুষের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না। সবাই সেই পাহাড়ের নিচে গিয়ে জড়ো হল। এইভাবে কৃষ্ণ প্লাবনের হাত থেকে ব্রজধামকে বাঁচালেন।

সাতদিন ধরে শ্রীকৃষ্ণ আঙুলে গোবর্ধন পাহাড় ধরে রাখলেন। শেষে ইন্দ্রকে হার মানতে হল। ইন্দ্রের গর্ব ভেঙে গেল। ব্রজের সকলে কৃষ্ণের ভক্ত হয়ে উঠল। সবাই কৃষ্ণকে গোবর্ধনধারী নামে ডাকতে লাগল।

কংস, কৃষ্ণ ও তাঁর বড় ভাই বলরামকে হত্যা করবার চেষ্টা ছাড়েন নি। অরিষ্টাসুর, কেশী আর ব্যোমাসুর নামে তিনজন দৈত্যকে পাঠালেন দু-ভাইকে হত্যা করার জন্যে। তিনজনই কৃষ্ণ ও বলরামের হাতে প্রাণ হারাল।

কংস দেখলেন ব্রজধামে কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করা খুবই কঠিন। তখন তিনি আরেক চাল চাললেন। মথুরায় এক বিশাল উৎসবের আয়োজন করলেন। সেখানে কৃষ্ণ ও বলরামকে আমন্ত্রণ জানালেন।

এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ মথুরায় যাবার জন্যে ত্বরিতে প্রস্তুত হলেন। বলরামও পিছিয়ে রইলেন না। কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরাম মথুরা যাবেন জেনে ব্রজবাসীর দুঃখের আর সীমা-পরিসীমা রইল না।

কৃষ্ণের সামনে তখন এক লক্ষ্য, কংসকে শেষ করতে হবে। মথুরা

না গেলে সে কাজটি হয় না। ব্রজের যত গোপবালক, যত গোপ ও গোপিনী সকলকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নন্দ, বলরাম ও আরো কজন গোপকে নিয়ে কৃষ্ণ মথুরা গেলেন। ব্রজের সবাই কৃষ্ণকে বিদায় দিতে এল।



কারো চোখের জল যেন আর থামতে চায় না। মেয়েরা ত স্নান-খাওয়া ছেড়ে দিল। কোথায় সেই রাসলীলা, হাসি ও কৌতুকে আনন্দমুখর ব্রজধাম! চারদিক যেন শূন্য হয়ে গেল।

কৃষ্ণ যখন মথুরা পৌছলেন তখন ওঁকে দেখবার জন্যে পথের দুদিকে ভিড় জমে গেল। মথুরার লোকরা ত' কৃষ্ণের বীরত্বের কাহিনী আগেই শুনেছে।

কৃষ্ণ চলেছেন, দেখেন বাঁকাচোরা শরীর এক কুঁজী বুড়ি চন্দনের পাত্র হাতে চলেছে। কৃষ্ণ জানতে চাইলেন ও কোথায় চলেছে।

সে বলল, 'আমার নাম ত্রিবলা। কিন্তু আমার শরীর এইরকম ত্রিভঙ্গ বলে লোকে আমায় কুব্জা বলে ডাকে। আমি মহারাজ কংসের জন্যে চন্দন নিয়ে যাচ্ছি।'

'আমাকে চন্দন মাখিয়ে দাও।'

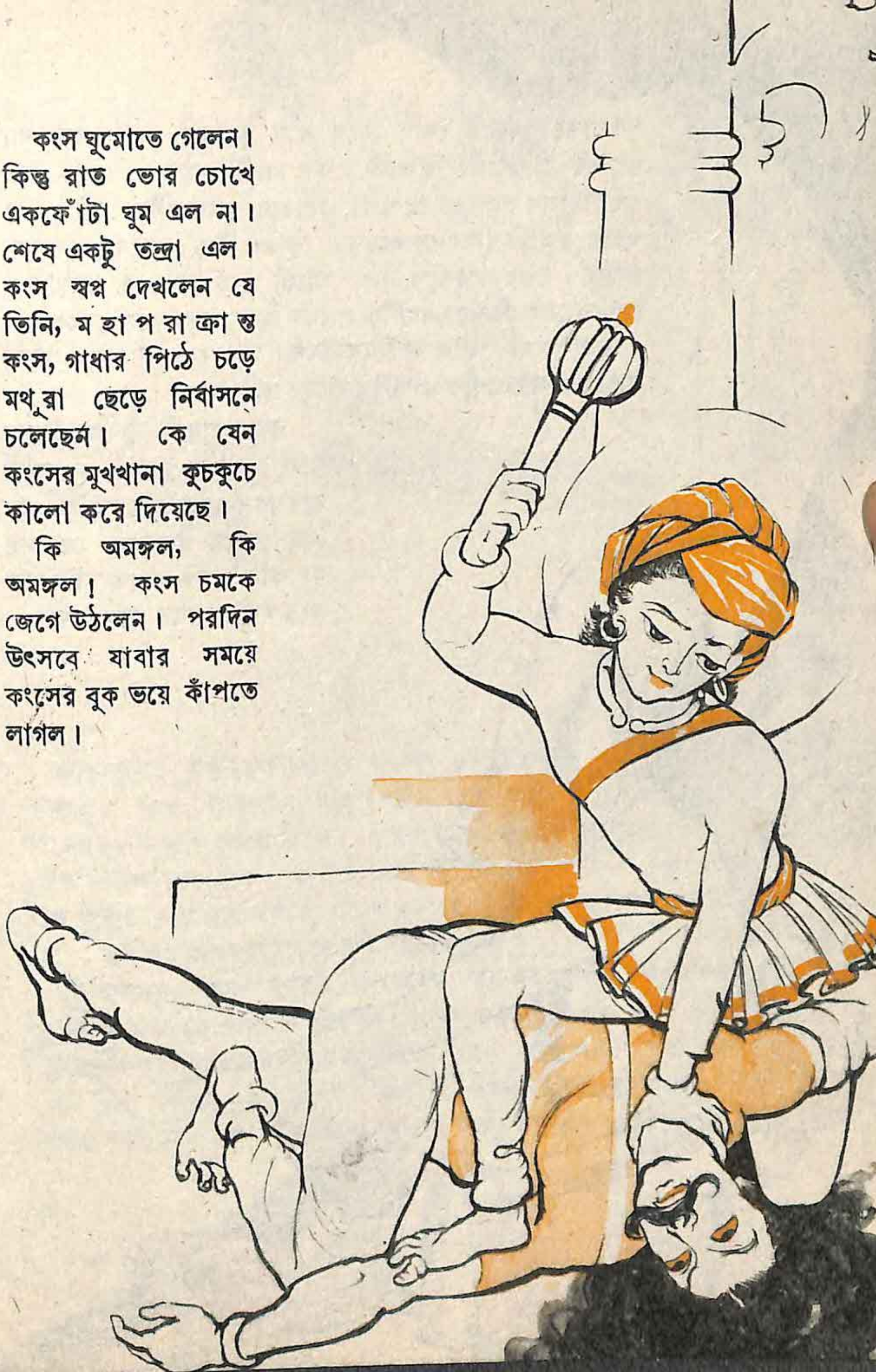
কুব্জা মানুষটা বড় হাসিখুশি। ও ভাবল, বা এ ত বেশ কৌতুক হল। ও কৃষ্ণের সারা শরীর চন্দন লেপে দিল। চারদিক সুগন্ধে ভরে গেল। কৃষ্ণ কুব্জাকে পুরস্কার দিতে চাইলেন। কুব্জার পায়ে কৃষ্ণ এক লাথি মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুব্জার শরীর থেকে কুরূপ চলে গেল, দেহ সুঠাম সুন্দর হয়ে গেল। কুরূপা কুব্জা এক অপরূপ সুন্দরী হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে মথুরায় সবাই জেনে গেল যে কৃষ্ণের কৃপায় কুরূপা কুব্জা সুন্দর হয়ে গিয়েছে। যে শুনল সেই অবাক মানল।

বিস্ময় বিহ্বল কুব্জা দাঁড়িয়ে রইল। কৃষ্ণ গোপবালকদের সঙ্গে যেখানে ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা হচ্ছে সেখানে গেলেন। সৈনিক ও প্রহরীরা কৃষ্ণকে বাধা দেবার আগেই কৃষ্ণ সেই বিশাল ধনুক টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললেন। সেখানে যেসব অসুররা একত্র হয়েছিল তাদেরও মেরে ফেললেন।

কংস ত সব খবরই পেলেন। বুকের ভেতরটা ভয়ে কাঁপতে লাগল। তবে কংসের সভায় অনেক মল্লবীর ছিল। তাদের ওপর রাজার খুব বিশ্বাস। কংস ভাবলেন হাতীর মত শক্তিশালী এইসব মল্লদের কৃষ্ণ ও বলরাম এঁটে উঠতে পারবেন না।

কংস ঘুমোতে গেলেন। কিন্তু রাত ভোর চোখে একফোঁটা ঘুম এল না। শেষে একটু তন্দ্রা এল। কংস স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি, মহাপরাক্রান্ত কংস, গাধার পিঠে চড়ে মথুরা ছেড়ে নির্বাসনে চলেছেন। কে যেন কংসের মুখখানা কুচকুচে কালো করে দিয়েছে।

কি অমঙ্গল, কি অমঙ্গল! কংস চমকে জেগে উঠলেন। পরদিন উৎসবে যাবার সময়ে কংসের বুক ভয়ে কাঁপতে লাগল।

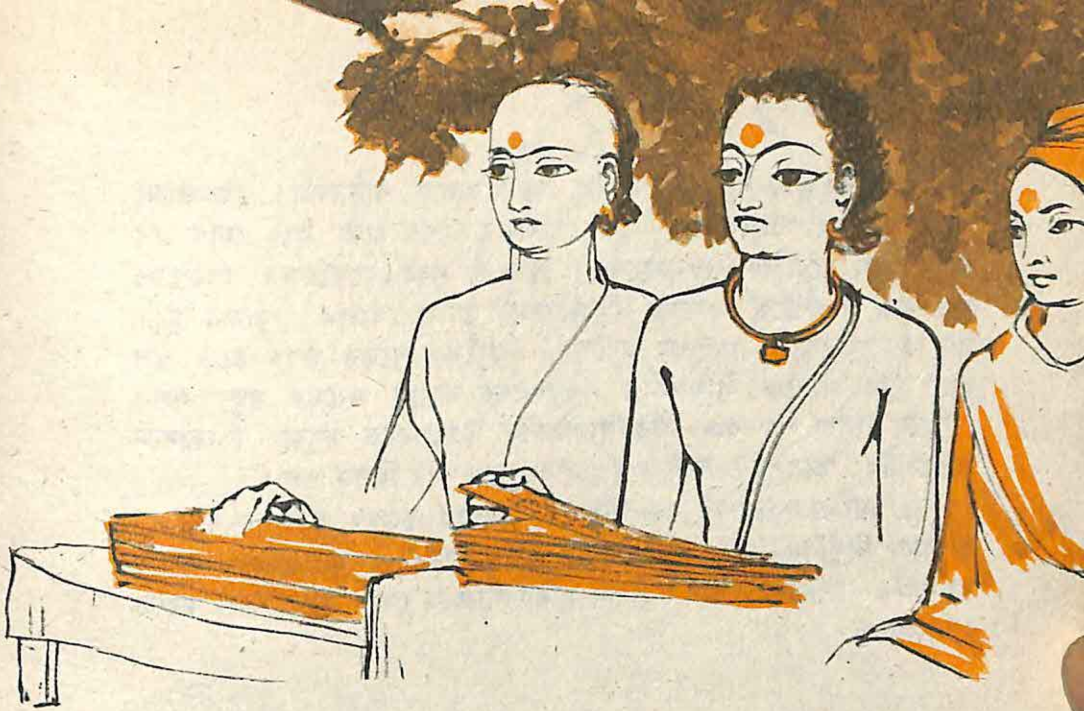


প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে বলে দূর দূর থেকে কত মল্ল এসেছে। কংসের নিজেরই ত কত মল্লবীর আছে। তার ওপর কংস উৎসব ভূমিতে প্রবেশের তোরণে কুবলয়াপীড় নামে এক মহাকায় হাতি বেঁধে রেখেছেন। কুবলয়াপীড় যেমন হিংস্র তেমন উদ্দাম। ওর মাহুতকে বলা আছে, যেই কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখবে সেই যেন কুবলয়াপীড় পায়ের নিচে ওদের দলে ফেলে।

দুভাই যখন সঙ্গীসাথী নিয়ে উৎসব প্রাঙ্গনে পৌঁছলেন তখন মাহুতের আদেশে কুবলয়াপীড় ওঁদের তাড়া করল।

কৃষ্ণ প্রথমে কুবলয়াপীড়ের সঙ্গে খানিকটা খেলা করলেন। তারপর কুবলয়াপীড়ের শুঁড় ধরে এত জোরে টানলেন যে সেই মহাকায় হাতি আর্ত চিৎকার করে মাটিতে পড়ে মরে গেল।





ক্রীড়াভূমির চারদিকে মল্লদের উৎসাহ দেবার জন্যে নানারকম বাজনা বাজছে। কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে ক্রীড়াঙ্গনে ঢুকলেন। তাঁদের দেখেই কংসের চোখ ভয়ে চমকে উঠল। চাণুক নামে এক মল্ল কৃষ্ণকে যুদ্ধে ডাকল। মুষ্টিক ডাকল বলরামকে। দু-ভাই কবে আর পিছু হটেছেন। দু-জনেই তাল ঠুকে কুস্তির আখড়ায় নেমে পড়লেন। সবাই ত ওঁদের সাহস দেখে হেসে খুন। এই সব বালকরা লড়বে ওই মল্লদের সঙ্গে?

দুই বালককে দেখে মথুরার মেয়েদের বড় দয়া হল। তাঁরা কংসকে মিনতি করে এ যুদ্ধ থামাতে বললেন। কৃষ্ণ ও বলরাম যুদ্ধ শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কৃষ্ণ মল্লযুদ্ধে চাণুককে মেরে ফেললেন। কৃষ্ণ সজোরে একটি ঘুষি মারেন। সেই ঘুষি খেয়েই চিৎকার করতে করতে চাণুক মাটিতে পড়ে মরে গেল। ওদিকে বলরাম হত্যা করলেন মুষ্টিককে।

কংস তখন কুট, শল্য ও তোশল, তিন মল্লকে পাঠালেন। তিনজনেই মারা গেলেন। এবার কংস ভয় পেলেন। শেষ চেষ্টা করে দেখি এই ভেবে কংস তরোয়াল বের করলেন। কৃষ্ণ ত সবই বুঝেছেন। বিদ্যুতের মত কৃষ্ণ একলাফে কংসের সিংহাসনের কাছে গেলেন। চুলের মুঠো ধরে কংসকে টেনে নামালেন মাটিতে। কংসের বুকের ওপর চড়ে বসে কৃষ্ণ ঘুষি মারতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কংসের মৃত্যু হল।

কংস হত্যার পর কৃষ্ণ তাঁর দাদামশাই উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে বসালেন। তারপর দেবকী ও বসুদেবের সঙ্গে তাঁর মিলন হল।

সারা রাজ্যে আনন্দের বান ডাকল। মথুরায় কৃষ্ণের কাজ শেষ হল। মথুরায় কিছুদিন থেকে উজ্জয়িনীর অবন্তীপুরে রওনা হলেন কৃষ্ণ ও বলরাম। সেখানে তাঁরা সন্দীপন মুনির আশ্রমে থেকে বিদ্যাশিক্ষা করতে লাগলেন।





অভিমন্যু বধ

মহাভারতের যুদ্ধের দ্বাদশ দিনের কথা।

আজকের যুদ্ধে অর্জুন শকুনিকে হত্যা করেছেন। শকুনির দুই ভাই বৃষক ও অচল নিহত হয়েছে। অর্জুনের রণকৌশলের সঙ্গে দ্রোণের মত যোদ্ধাও এঁটে উঠতে পারছেন না। তাই কৌরব শিবিরে শুধু হতাশা আর উদ্বেগ, আর পাণ্ডব শিবিরে শুধুই উৎসাহ ও আনন্দের উচ্ছ্বাস।

পরাজয়ের দুঃখে দুর্যোধন ক্ষেপে গেছেন একেবারে। পূজ্য গুরুজনদের ত যা-নয়-তাই বলছেন। সৈন্যদের সামনেই দ্রোণকে বলেছেন অর্জুনের প্রতি স্নেহ বশত দ্রোণ তাঁর সবটুকু সামর্থ দিয়ে যুদ্ধ করছেন না। এমন কথাও বলেছেন যে পাণ্ডবদের ওপরে দ্রোণের যত পক্ষপাত।

এ অপমানে দ্রোণ একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন। মহা দুঃখে বলেছেন, 'দুর্যোধন, আমি যথাসাধ্য যুদ্ধ করছি পাণ্ডবদের সঙ্গে। তবু তুমি আমায় সন্দেহ করছ। আমি তোমায় আগেও বলেছি এখনো বলছি, যেমন করে হক অর্জুনকে পাণ্ডব সেনার কাছ থেকে সরিয়ে ফেল। দেখবে একদিনেই আমি ওদের হারিয়ে দেব। অর্জুন পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকলে ওদের হারানো সত্যিই সম্ভব নয়।'

দ্রোণের কথা শুনেই দুর্যোধন পরদিনের যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে লেগে গেছেন।

ত্রয়োদশ দিন শুরু হয়েছে।

দু-পক্ষের সৈন্যই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে নেমেছে। যুদ্ধ করতে করতে অর্জুন চলে গেছেন দক্ষিণ দিকে। অর্জুন যেই দক্ষিণ দিকে সরে গেছেন অমনি সেই সুযোগে দ্রোণ চক্রব্যূহ তৈরি করে ফেলেছেন। সেখান থেকেই তিনি অন্য কৌরবদের সঙ্গে পাণ্ডবসেনাকে আক্রমণ করে চলেছেন। পাণ্ডবসেনা দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন বটে, কিন্তু দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করা ত খেলার কথা নয়। চক্রব্যূহে ঢোকবার পথও সকলের জানা নেই।

এদিকে স্বপক্ষের হার হয় দেখে যুধিষ্ঠির মহা চিন্তিত। অর্জুন এখানে উপস্থিত নেই। আর কারোত চক্রব্যূহে ঢোকবার পথ জানা নেই।





হঠাৎ অভিমন্যুর কথা মনে হল। অভিমন্যুকে ডাকলেন যুধিষ্ঠির। অভিমন্যু অর্জুনের ছেলে। মাত্র ষোল বছর বয়স তাঁর। পিতার মতই বীর, সেই রকমই সাহসী। কৌরবরাও এই বীর কিশোরকে ভয় পান।

যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে অভিমন্যু তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন। অভিমন্যুর তেজস্বী চেহারা দেখে যুধিষ্ঠিরের মন থেকে চিন্তার ভাব যেন নেমে গেল। যুধিষ্ঠির পাণ্ডবদের বিপদের কথা বলে বললেন, চক্রব্যূহে ঢোকবার পথ জানেন না বলে কত পাণ্ডব যোদ্ধা এর মধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন। এ ভাবে যুদ্ধ চললে পাণ্ডবদের হার হতে আর বেশি দেরি নেই।

অভিমন্যু বললেন, 'আপনি ভাববেন না। আমি একাই চক্রব্যূহে ঢুকে কৌরবসেনাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলব।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'মহারাজ! একটা কথা। চক্রব্যূহ ভেদ আমি করতে পারি কিন্তু বেরোবার পথ জানি না যে!'

অভিমন্যু তখনো পৃথিবীর আলো দেখেননি। মা সুভদ্রার কোলের ভেতরেই আছেন। সেই সময় অর্জুন সুভদ্রাকে চক্রব্যূহে ঢোকবার আর বেরোবার কথা বলছিলেন। সুভদ্রা ওই ঢোকবার কথাটুকু শুনেই ঘুমিয়ে পড়েন। কোলের ভেতর থেকে অভিমন্যু সবই শুনলেন। কিন্তু মা ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখে বাবা আর বাকিটুকু বলেননি। তাই অভিমন্যুর চক্রব্যূহ থেকে বেরোবার পথটি শেখা হয়নি।





যুধিষ্ঠির মহাখুসি হলেন। বললেন, 'পুত্র! তুমি চক্রব্যূহ ভেদ করে ঢোক। আমরা সবাই তোমার পেছন পেছন ঢুকব।' ভীমসেনও তাই বললেন। তখন আর এ কথা ছাড়া উপায় নেই।

যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন অভিমন্যু, তাঁর আশীর্বাদ নিলেন। তারপর রথে চড়ে কৌরবসেনাদের দিকে ধেয়ে চললেন। সঙ্গে সঙ্গে কৌরব সেনাদের মধ্যে কানাকানি পড়ে গেল অভিমন্যু আসছেন! দেখে মনে হল এক সিংহশাবক একা হাতির পালকে আক্রমণ করতে চলেছে।

অভিমন্যু চক্রব্যূহের কাছে পৌছলেন। বিদ্যুৎ বেগে আক্রমণ শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চক্রব্যূহের প্রবেশদ্বার ভেদ করে ফেললেন। এমন বিদ্যুৎ গতিতে অভিমন্যু ব্যূহের প্রবেশ মুখ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেলেন যে পাণ্ডবরা পেছনে পড়ে রইলেন। অভিমন্যু একলা ব্যূহে ঢুকলেন।

অভিমন্যুর বীরত্ব দেখে কৌরবরা অবাক মানল। যেমন অবহেলে গাছপালা কাটে, সেইভাবে কৌরবদের কেটে কুচিকুচি করতে করতে

অভিমন্যু এগিয়ে চললেন। আগুন যেমন সব ভস্ম করতে করতে যায়, অভিমন্যু তেমনি সব ধ্বংস করতে করতে চললেন।

বালকের হাতে সৈন্যদের এ দুর্দশা দুর্যোধন যেন আর দেখতে পারলেন না। একলাই অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চললেন। দ্রোণ তাড়াতাড়ি আর ক-জন যোদ্ধাকে দুর্যোধনের সাহায্যে পাঠালেন। ততক্ষণে অভিমন্যু দুর্যোধনকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন। কৌরব বীররা বহু কষ্টে দুর্যোধনের প্রাণটুকু বাঁচালেন।

দুর্যোধনের দুর্দশা দেখে কৌরবরা কৌশল শুরু করলেন। সে সময় যুদ্ধ মানেই ধর্মযুদ্ধ। নিয়ম মেনে যুদ্ধ করতে হত। যুদ্ধক্ষেত্রে নীতি বিসর্জন দেওয়া চলত না। একযোদ্ধা আর একজন যোদ্ধার সঙ্গেই যুদ্ধ করতেন। অনেকে মিলে একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন না। কিন্তু কৌরবরা যেন যুদ্ধের সব নীতি ভুলে গেলেন। ওঁরা সবাই মিলে একা অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। অভিমন্যু কিন্তু বিচলিত হলেন না। অসীম বীরত্বে যুদ্ধ করে চললেন।

অভিমন্যুর রণকৌশল দেখে দ্রোণ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কৌরবদের বললেন, 'যুদ্ধে অভিমন্যুর সমকক্ষ কেউই নেই।'

শুনেই চটে উঠলেন দুর্যোধন। বললেন, 'আচার্য! আপনি অর্জুনকে স্নেহ করেন তাই এইসব কথা বলছেন। নইলে ওই বালককে এত প্রশংসা করছেন কেন? ও ত একটা ষোল বছরের ছেলে মাত্র। ওকে আমি মুঠোয় ধরে গুড়িয়ে মশলা করে ফেলতে পারি।'

কিছুক্ষণ আগেই যে প্রাণটি যাচ্ছিল সে কথা দুর্যোধন ভুলেই গেছেন। দুর্যোধনের ভাই দুঃশাসনও বললেন, 'আমি এখনি গিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করছি।'

এ কথা বলে অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন বটে কিন্তু অভিমন্যুর আশ্চর্য বীরত্বের সামনে দুঃশাসনের সব অহঙ্কার ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুঃশাসন হেরে গিয়ে রথে গড়াগড়ি খেতে থাকলেন। দুঃশাসনকে মূর্ছা যেতে দেখে কৌরবরা চেঁচিয়ে বিলাপ জুড়ে দিল। তাই শুনে বাইরে থেকে পাণ্ডবরা অভিমন্যুর জয়ধ্বনি দিতে থাকল।

এ সব দেখেশুনে কর্ণ রেগে গেলেন। ধনুক নিয়ে অভিমন্যুর দিকে

দৌড়লেন। অভিমন্যু কর্ণের সঙ্গেও অসীম বীরত্বে লড়তে লাগলেন। অন্য কৌরবসেনারাও অভিমন্যুর অস্ত্রাঘাতে তখন ক্ষতবিক্ষত। কৌরবসেনা বিপর্যস্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ষোল বছরের এই কিশোর একাই কৌরব-সেনাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেললেন।

মনে হল অভিমন্যুকে পরাজিত করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। দ্রোণাচার্যের পরিকল্পনাও নষ্ট হয়ে যেতে বসল। অর্জুনকে দূর সরিয়ে নিয়ে গেলে পাণ্ডবদের হারানো সোজা হবে মনে হয়েছিল। তা ত হচ্ছে না। অভিমন্যু ত সকল কৌরবসেনাদের বীরত্বের গর্বই ধুলোয় লুটিয়ে দিলেন। এই দেখে দুঃশাসনের ছেলে লক্ষ্মণ আর স্থির থাকতে পারলেন না। লক্ষ্মণও বালকমাত্র। হাতে গদা নিয়ে লক্ষ্মণ এগোলেন। তা দেখে কৌরব পক্ষে বেশ একটা নতুন উৎসাহের সঞ্চার হল। যে সব কৌরবসেনা পালিয়ে যাচ্ছিল তারা ফিরে এল। যুদ্ধ শুরু হল।

অভিমন্যু আর লক্ষ্মণ, দুই বীর কিশোর যুদ্ধ করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ মহাবীরত্বের সঙ্গে লড়লেন কিন্তু অভিমন্যুর কাছে পারলেন না। তাঁর প্রাণহীণ দেহ মাটিতে আছড়ে পড়ল।

দুঃশাসন শোকে ভেঙে পড়লেন। দুর্যোধনের ক্রোধের আর সীমা রইল না। অন্য যোদ্ধাদের ডেকে দুর্যোধন একা অভিমন্যুর ওপর লাফিয়ে পড়লেন।

দ্রোণ কর্ণকে বললেন, 'দেখ! এ ভাবে অভিমন্যুকে হারানো যাবে না। তুমি পেছনে গিয়ে ওর ধনুকের ছিলা কেটে দাও। আমি অন্য যোদ্ধাদের সঙ্গে ওর সারথি ও ঘোড়াকে বধ করছি।'

কর্ণ দ্রোণের আদেশ পালন করতে গেলেন। বিদ্যুৎ গতিতে পেছনে গিয়ে কর্ণ অভিমন্যুর ধনুকের ছিলা কাটলেন। ওদিকে মহারথীরা মিলে তীর মেরে অভিমন্যুর সারথি ও রথের ঘোড়া বধ করলেন। তাতেও দমলেন না অভিমন্যু। ঢাল তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। বিদ্যুৎ গতিতে তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে অভিমন্যু যুদ্ধাঙ্গনের যেখানে যান, সেখানেই সকলকে মেরে ফেলেন।

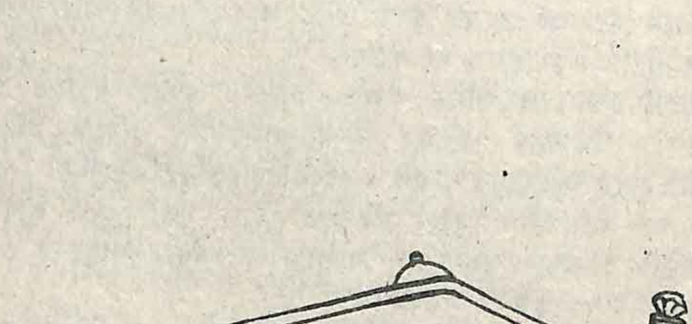
আচার্য দ্রোণ আবার চিন্তায় পড়লেন। এ বালককে ত কিছুতে হারানো

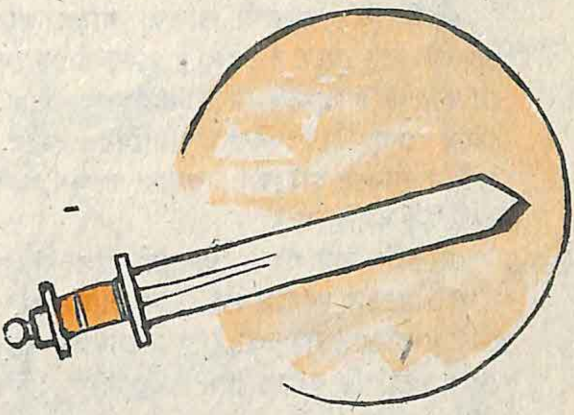
যাচ্ছে না! এ যে কৌরবদের মহা লজ্জার কারণ হল। তিনি কর্ণকে ডেকে তাঁর সঙ্কল্প জানালেন। এখন, সেই অনুযায়ী দুই মহারথী গিয়ে অভিমন্যুর ঢাল ও তরোয়াল কেটে ফেললেন। তরোয়াল কাটা পড়তে অভিমন্যু এক মুহূর্ত থমকে রইলেন। তারপরই নিজের রথের ভাঙাচাকা তুলে নিয়ে আহত সিংহের মত গর্জাতে গর্জাতে অভিমন্যু শত্রুদের আঘাত করতে লাগলেন। কৌরবরা হতচকিত, বিমূঢ়। এখন দুঃশাসনের দ্বিতীয় ছেলে গদা হাতে এগোলেন। অভিমন্যুও রথের চাকা ফেলে গদা হাতে নিলেন।

দুজনে যুদ্ধ করতে করতে জাপটাজাপটি করে মাটিতে পড়লেন। একলা এতক্ষণ ধরে যুদ্ধ করে করে অভিমন্যু তখন ক্লান্ত। একবার একটু দেরি হল অভিমন্যুর, কিন্তু সেই হল কাল। অভিমন্যুকে একমুহূর্ত নিশ্চল পেয়েই দুঃশাসনের ছেলে গদা মেরে তাঁকে মেরে ফেললেন।

অভিমন্যুর মৃত্যুতে কৌরবরা উল্লাস করল। শুধু কর্ণ ও দ্রোণ কাঁদতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র যুযুৎসুর এ অধর্ম যুদ্ধ সহ্য হল না। তিনি বললেন, 'এ অন্যায় হয়েছে। একাকী এক বালককে মেরে তোমরা আবার বড়াই করছ? লজ্জা হওয়া উচিত তোমাদের। ধিক তোমাদের!' অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে যুযুৎসু রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন।

অভিমন্যুর মৃত্যুতে পাণ্ডব শিবিরে কান্নার ঝড় উঠল। অর্জুনের মাথায় যেন বাজ পড়ল। তবে মরেও অভিমন্যু অমর হয়ে রইলেন।





লব ও কুশ

সবুজ বনের বুকে ছোট একটি কুটির। কুটিরের সামনে কয়েকটি বালক খেলা করছিল। কয়েকটি মুনিকুমার আর কয়েকটি জঙ্গলের বাসিন্দাদের ছেলে। হঠাৎ সামনে ধুলো উড়ে মেঘ ঘনিয়ে এল। ওদের খেলা থেমে গেল। একটি ছেলে ভয় পেয়ে বলল, 'পালাও, পালাও, নিশ্চয় সৈন্য আসছে।' ছেলেরা তখন খেলার নেশায় মেতে আছে। কথাটা ওদের কানেই গেল না। ওরা আবার খেলায় ডুবে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে একটি সুন্দর কালো ঘোড়া ছুটতে ছুটতে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। ঘোড়ার কপালে একটা সোনার পাত। তাতে লেখা আছে, 'এ অশ্ব অযোধ্যার চক্রবর্তী মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের। মহাপরাক্রমী শত্রুঘ্ন এ অশ্বকে রক্ষা করছেন। মনে করা হবে যে দেশ দিয়ে এই অশ্ব যাবে, সেই দেশই বিজিত হল। যে অযোধ্যার মহারাজকে সম্রাট বলে মানতে চায় না সে এই অশ্ব ধরুক আর এই অশ্বের অনুগামী সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করুক।'

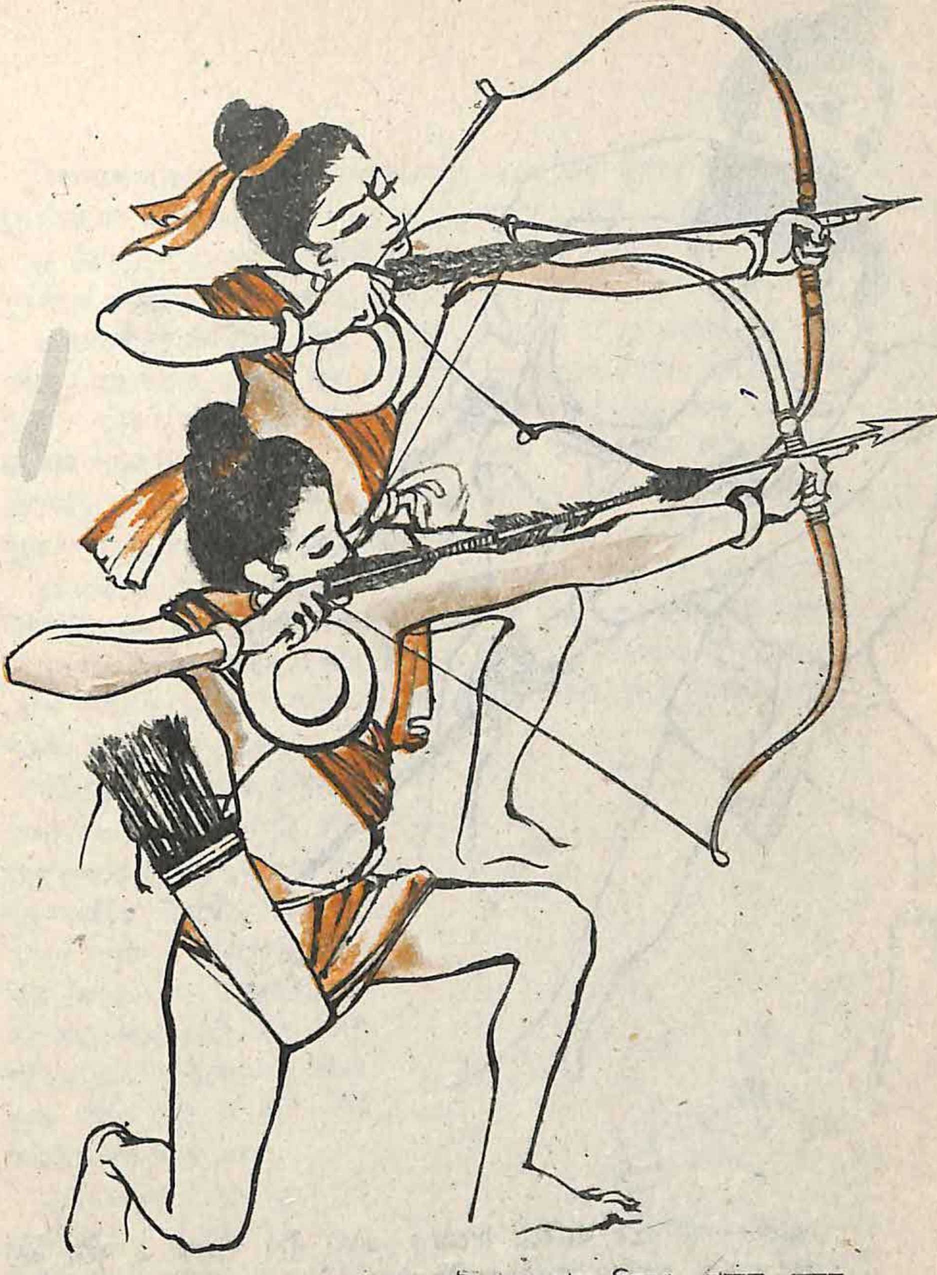
একটি সুন্দর তেজস্বী বালক, হাতে তার তীর ধনুক, সোনার পাতে লেখাটি পড়ে হেসে বাঁচে না। ছেলেটিকে দেখে মনে হয় ক্ষত্রিয় বালক। সে তীর-ধনুক সামলে নিয়ে সঙ্গীদের ডেকে বলল, 'আমরা এ ঘোড়াকে যেতে দেব না। এরা আমাদের বনকে পর্যন্ত অযোধ্যা সাম্রাজ্যের অধীনে আনতে চাইছে। আমরা যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তা হতে দেব না। বল, ঠিক বলছি না?'

ছেলেটির নাম লব। ওর সঙ্গী বালকরা এক স্বরে বলল, 'ঠিক বলেছ।'

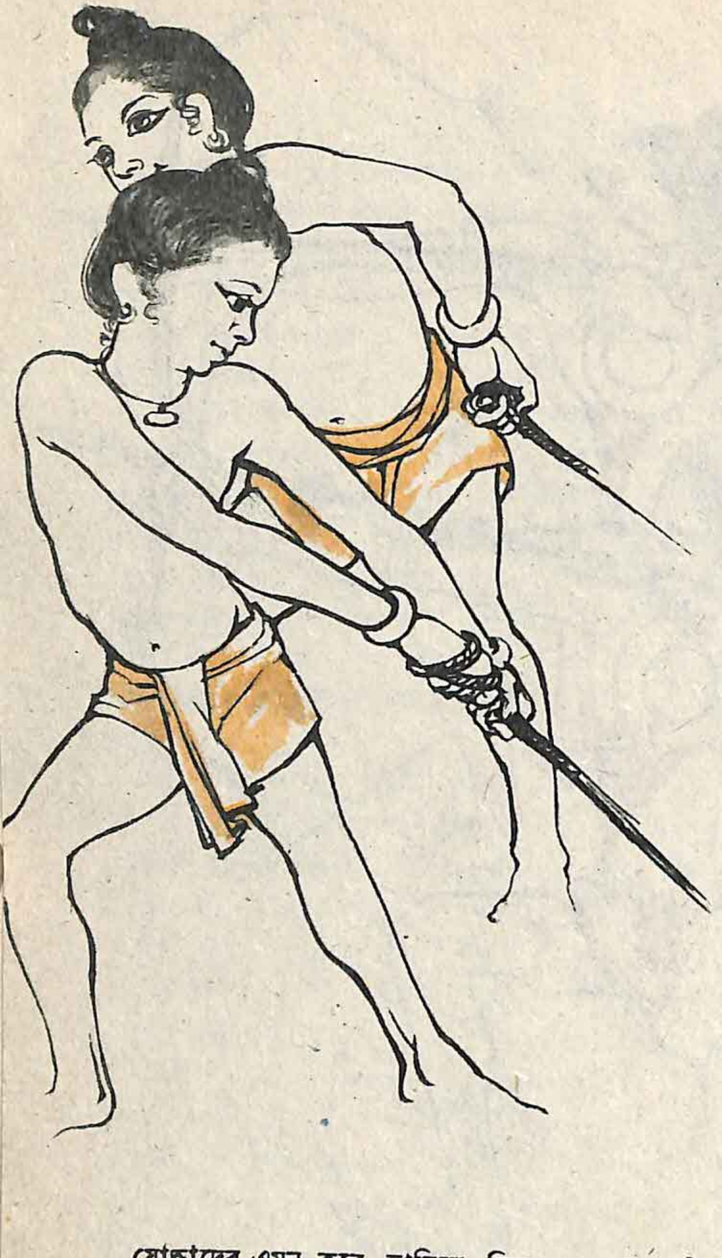
লব ঘোড়ার লাগাম ধরে টেনে এনে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল। সেই সময়ে ঘোড়ার রক্ষী সৈন্যরা সেখানে এসে পৌঁছল। ঘোড়া বাঁধা আছে দেখে ওরা দড়ি খুলতে গেল। ওরা ভেবেছিল ছেলেরা খেলার ছলে ঘোড়া বেঁধে রেখেছে। ওরা কয়েক পা এগিয়েছে কি এগোয়নি, লব বাণ চালিয়ে কয়েকজন সৈন্যকে মেরে ফেলল। সৈন্যরা বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্রুদ্ধ হয়ে ওরা লবের দিকে তাকাল। লব সগর্বে বলল, 'আমি ঘোড়া বেঁধেছি। যে সৈন্য ঘোড়া খুলতে চায় তাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।'

লবের এরূপ উগ্র চেহারা দেখে সৈন্যরা বেজায় ঘাবড়ে গেল। ওরা তাড়াতাড়ি ওদের সেনাপতি শত্রুঘ্নের কাছে গেল। শত্রুঘ্ন সব শুনে তাঁর প্রধান সেনাপতি কালজিতকে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। কালজিত তাঁর সৈন্যদের নিয়ে এক ব্যূহ রচনা করলেন। নিজে এগোলেন লবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। লবকে আদর করে, ভাল কথায় বোঝাতে চেষ্টা করলেন কালজিত। লব সে কথা কানেই নিল না। কালজিতের তখন যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য উপায় রইল না।

সৈন্যদের ডেকে কালজিত আপনি এগোলেন। কালজিত কয়েক পা এগোতে না এগোতে লব বৃষ্টি ধারার মত ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ ছুঁড়তে সুরু করল। সৈন্যরা হতাহত হয়ে পালাতে শুরু করল। তা দেখে কালজিত তরোয়াল বের করলেন। লবকে এগোতে বললেন। লব হাসতে হাসতে তূণ থেকে তীর নিল, ছুঁড়ল। তীর সাঁ করে গিয়ে সোজা কালজিতের বুকে বিঁধল। মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে কালজিত মারা গেলেন।



সৈন্যেরা পালিয়ে গিয়ে শত্রুঘ্নকে এই দুঃসংবাদ দিল। শত্রুঘ্ন যেমন উদ্বিগ্ন হলেন, তেমনি বিস্মিত। কে এই অদ্ভুত বালক? যে বড় বড়



যোদ্ধাদের এমন করে হারিয়ে দিচ্ছে? এমন বীর বালক এ বনে এল কোথা হতে? হনুমান, অঙ্গদ, সুগ্রীব সকলকে নিয়ে শত্রুঘ্ন যুদ্ধে চললেন।

বীরবেশে বালক লবকে দেখে শত্রুঘ্নের মনে স্নেহ উপছে উঠল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র বড় নির্মম জায়গা—সেখানে স্নেহ মমতার স্থান নেই। এ বালক এখন ওঁর শত্রু—শত্রুকে হারানোই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। শত্রুঘ্ন আগে মহাবীর পুষ্কলকে পাঠালেন। পুষ্কল লবের কাছে হেরে গেলেন।

তা দেখে হনুমান আর স্থির থাকতে পারলেন না। একটা বড় গাছ ভেঙে নিয়ে হুঙ্কার করতে করতে লবকে আক্রমণ করলেন। লব প্রস্তুত ছিল। তীর ছুঁড়ে লব হনুমানের হাতের গাছ টুকরো টুকরো করে ফেলল। হনুমান তখন নিজের ল্যাজটা লম্বা করে ফাঁসের মত লবের দিকে এগিয়ে দিলেন। লব এক মুহূর্তে সে ফাঁস থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে হনুমানের বুকে এক ঘুষি মারল। হনুমান অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

হনুমানকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখে শত্রুঘ্ন মহা চিন্তিত হলেন। এইটুকু ছেলে এমন রণকৌশল শিখল কোথা থেকে? এত শক্তি পেল কোথায়? শত্রুঘ্ন ভেবে ভেবে অবাক হলেন। শত্রুঘ্নকে যুদ্ধে নামতে দেখে লব ত হেসেই অস্থির। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বাণের ঘায়ে শত্রুঘ্ন অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

শত্রুঘ্নের সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তারা সবাই একত্র হয়ে লবকে আক্রমণ করল। লব তবু অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। এদিকে শত্রুঘ্নের জ্ঞান ফিরে এল। রামের দেওয়া এক মহা শক্তিশালী বাণ তিনি লবের দিকে ছুঁড়লেন। লবের বুকে গিয়ে তীর বিঁধল। লব অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

মুনিবালকরা গাছে চড়ে যুদ্ধ দেখছিল। ওদের খুব মজা লাগছিল। লবকে মূর্ছা যেতে



দেখে ওরা গাছ থেকে নেমে আশ্রমের দিকে দৌড়ল।

সে আশ্রম মহর্ষি বাল্মীকির। লব আর কুশ মা সীতার সঙ্গে সেখানেই থাকেন। ছেলেরা যখন গেল তখন সীতা কাজ করছিলেন। কুশ কুটিরের পাশেই খেলছিল। ছেলেরা যখন সীতা আর কুশকে লবের মূর্ছিত হবার খবর জানাল তখন সীতা কেঁদে ফেললেন। কুশ তা দেখে বলল, 'কেঁদ না মা! আমি এখনি গিয়ে লবের খবর এনে দিচ্ছি।' সীতার পা ছুঁয়ে কুশ যুদ্ধভূমির দিকে দৌড়ে চলে গেল।

লবের জ্ঞান ততক্ষণে ফিরে এসেছে। কুশকে দেখেই উঠে বসল লব। দু-ভাই দুজনের গলা জড়িয়ে আদর করল। তারপর নিজের নিজের তীর ধনুক নিয়ে দুজনে যুদ্ধ করতে শুরু করল। শত্রুঘ্ন ত সৈন্যদের আগেই যুদ্ধ শুরু করবার সঙ্কেত জানিয়েছেন। যুদ্ধ যে কি রকম হল সে আর কি বলি। এদিকে দুই বালক, ওদিকে অত বড় সেনাবাহিনী। হনুমান জ্ঞান ফিরে পেতেই একটা মস্ত পাথর হাতে নিয়ে এগোলেন। সঙ্গে অঙ্গদ চললেন। লব-কুশ দু-ভাই হাঁটু গেড়ে বসে তীর ছুঁড়ে চলল। অঙ্গদ আর হনুমান মূর্ছিত হয়ে গেলেন। অন্য যোদ্ধারাও অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুঘ্নের সেনাবাহিনী একেবারে হেরে গেল। কুশের তীরে শত্রুঘ্নও আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সবাইকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে লব আর কুশ বেজায় খুশি। গাছে বাঁধা ঘোড়ার দিকে একবার চায়, আরেকবার ভাবে এত বড় যুদ্ধটা জিতলাম, তা মাকে দেখাতে একটা চিহ্ন নিয়ে যাব না?

শত্রুঘ্নের মুকুট থেকে মহামূল্য মনি নিল ওরা। তারপর হনুমান আর অঙ্গদের ল্যাজ ধরে টানতে টানতে সীতার কাছে নিয়ে চলল। ছেলেরা একটা বাঁদর টেনে আনছে দেখে সীতার খুব হাসি পেল, কিন্তু কাছে আসতে সীতা যখন দেখলেন যে এরা হনুমান আর অঙ্গদ, তাঁর ভারি দুঃখ হল। লব আর কুশকে খুব বকলেন সীতা, হনুমান ও অঙ্গদ কে তা বললেন। সীতা তখন বুঝেছেন ঘোড়াটা রামের। লব আর কুশকে বললেন, 'বাছারা! এ ঘোড়া তোমাদের বাবার। যাও, তাড়াতাড়ি ওর বাঁধন খুলে দাও।'

বাবার নাম শুনে লব ও কুশের ভারি আনন্দ হল। দু-ভাই বলল, 'মা! তবে আমরা ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কাজই করেছি বল?'

সীতা আর কি বলবেন? ভাবতে লাগলেন রাম যখন জানবেন তখন কি বলবেন। সীতার পুণ্যবলে যুদ্ধক্ষেত্রে যারা আহত হয়েছিল তারা সুস্থ হয়ে উঠল, মৃতরা বেঁচে উঠল। শত্রুঘ্নেরও জ্ঞান ফিরে এল। শত্রুঘ্ন চুপচাপ অযোধ্যা চলে গেলেন। ঘোড়া তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেল।

সে সময়ে ঘোড়া সগৌরবে ফিরে আসার পর যজ্ঞ হত। তাকে বলা হত রাজসূয় যজ্ঞ। এই যজ্ঞতে যোগ দেবার জন্যে যত রাজা, মহারাজা, মুনি, ঋষি, সকলকে নিমন্ত্রণ জানানো হত। মহর্ষি বাল্মীকির কাছেও নিমন্ত্রণ গেল। বাল্মীকি লব ও কুশ দু-ভাইকে নিয়ে গেলেন। বাল্মীকির আশ্রমে লব ও কুশ দু-ভাই রামায়ণ পড়ত। সম্পূর্ণ রামায়ণ ওদের কণ্ঠস্থ। ওদের গলার স্বরও মধুর। দু-ভাই অযোধ্যার পথে পথে রামায়ণ গেয়ে ঘুরতে লাগল। সে রামায়ণ গান এতই মধুর যে লব-কুশ যেখানে গান গায় সেখানেই ভিড় জমে যায় মানুষের।

একদিন লব ও কুশ রাজপ্রাসাদের সামনে দিয়ে রামায়ণ গান গেয়ে গেয়ে চলেছে। রোজকার মত আজও ওদের পেছনে পেছনে মুগ্ধ শ্রোতাদের ভিড়। ওদের গান শুনে রাম মুগ্ধ হয়ে গেলেন। দু-ভাইকে ডাকলেন। রাজ প্রাসাদে ডেকে এনে রামায়ণ শুনলেন। দুজনকেই পুরস্কার দিতে চাইলেন রাম। লব-কুশ পুরস্কার নিল না। বলল, 'আপনি যদি সত্যি সত্যি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে প্রজাদের সঙ্গে একত্র হয়ে আমাদের রামায়ণ গান শুনুন। আমরা অন্য পুরস্কার চাই না।' রাম তাতে রাজি হলেন। যজ্ঞের কাজের শেষে রাম ও তাঁর প্রজারা একত্র রামায়ণ শুনলেন। সকলের চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল।

মানুষের মুখে লব কুশের প্রশংসা আর ধরে না। ঘরে ঘরে প্রশংসা। রামায়ণের গান শুনে রামের মন কেন যেন উদাস হয়ে গেল। কতদিন পরে সীতার কথা মনে পড়ল। তখন, এক অবসরে, বাল্মীকি রামকে সত্যি কথা খুলে বললেন। বললেন—রাম সীতাকে বনবাসে দেন, লক্ষ্মণ সীতাকে বনে রেখে চলে আসেন। তারপর থেকে সীতা বাল্মীকির

আশ্রমেই আছেন। সেখানেই লব-কুশ জন্মেছে।

লব ও কুশ সীতার ছেলে, তাঁর ছেলে, এ কথা জেনে রাম ছেলেদের বুকে তুলে নিলেন। লব ও কুশের সৌন্দর্য, পরাক্রম আর বুদ্ধি দেখে রাম ত আগেই মুগ্ধ হয়েছেন। এখন, এরা তাঁরই ছেলে, সে কথা জেনে আনন্দের আর সীমা রইল না। সীতাকেও অযোধ্যায় নিয়ে আসা হল। অযোধ্যা আনন্দ উৎসবে মুখর হয়ে উঠল। অযোধ্যাবাসীদের যে কি আনন্দ হল সে আর কি বলব।



ভরত ও সিংহ শাবক

পুরুবংশের দুষ্যন্ত বড়ই রূপবান, গুণবান, পরাক্রান্ত রাজা। দেবরাজ ইন্দ্র অবধি সঙ্কটের সময়ে দুষ্যন্তের সাহায্য চান। একবার রাজা দুষ্যন্ত দেবতা আর অসুরদের যুদ্ধের পর বিমানে রাজ্যে ফিরছেন। মেঘ থেকে বিমান ধীরে ধীরে মাটিতে নামছে। দুষ্যন্ত মুগ্ধ হয়ে নিচে পৃথিবীর শোভা দেখছেন। ধীরে বিমান এসে মারীচ ঋষির আশ্রমের সামনে থামল। রাজা রথ থেকে নামলেন। ভাবলেন ঋষির সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

বনের শোভা দেখতে দেখতে দুষ্যন্ত আশ্রমের দিকে চলেছেন। হঠাৎ কানে এল একজন মহিলা বলছেন, 'না বাছা! আমার কথা শোন। সিংহের বাচ্চাটা ছেড়ে দাও।' রাজা অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখেন একটি অতি সুন্দর তেজস্বী শিশু সিংহীর কাছ থেকে তার বাচ্চাকে উঠিয়ে নিয়ে জোর করে তার মুখ খুলতে চেষ্টা করছে। বলছে, 'মুখ খোল্। দেখি তোর কটা দাঁত।'

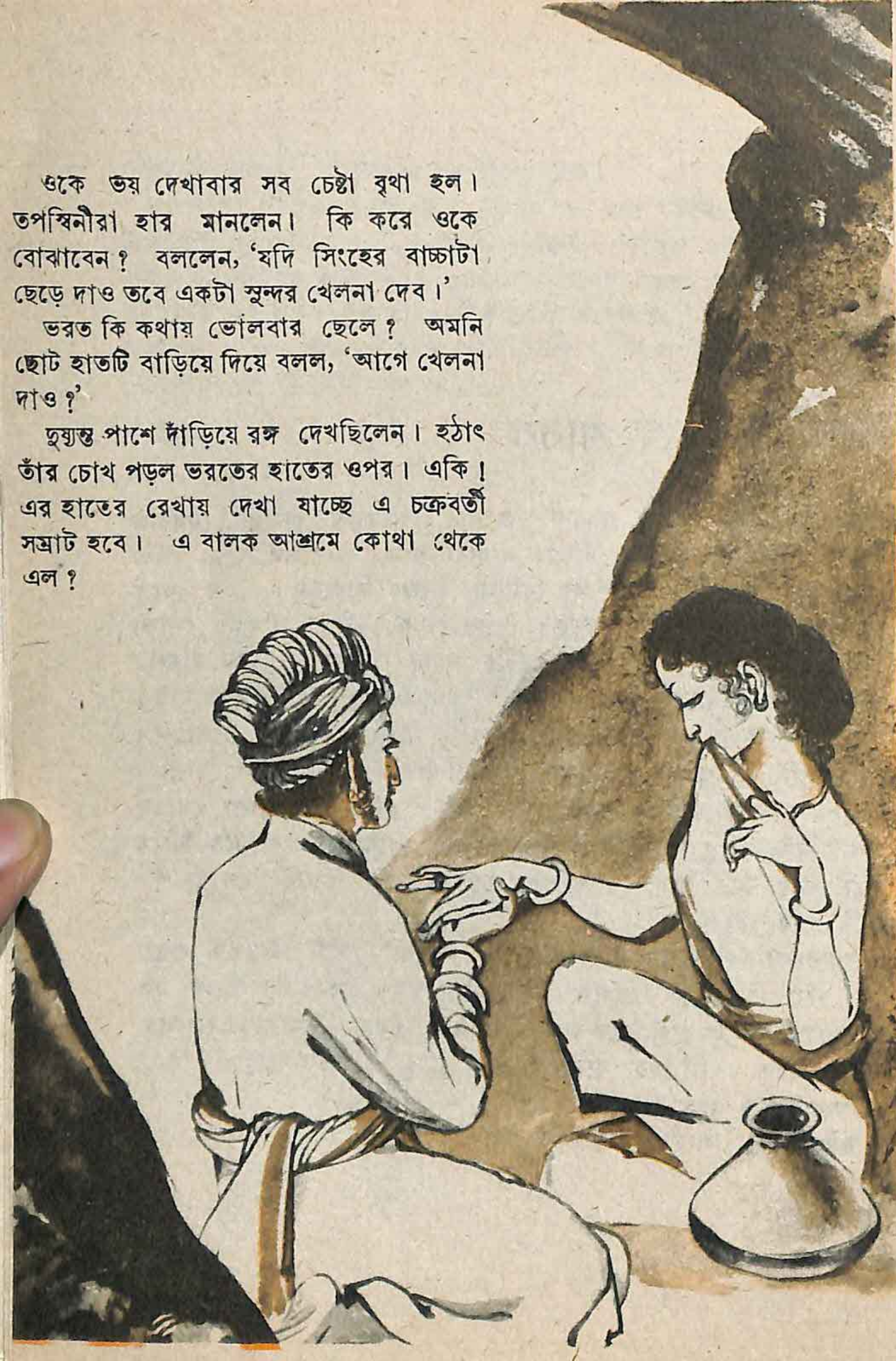
আশ্রমের দুজন তপস্বিনী শিশুকে বাগ মানাবার চেষ্টা করছেন। দুষ্যন্ত মুগ্ধ হয়ে ছেলেটিকে দেখতে থাকলেন। কেন যেন ওঁর ইচ্ছে হল ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করেন। একজন তপস্বিনী বললেন, 'বাছা ভরত! সিংহের বাচ্চাকে যদি ছেড়ে না দাও তাহলে সিংহী তোমায় নির্ঘাত আক্রমণ করবে।'

ভরত বলল, 'সিংহীকে আবার ভয় পায় কে?'

ওকে ভয় দেখাবার সব চেষ্টা বৃথা হল। তপস্বিনীরা হার মানলেন। কি করে ওকে বোঝাবেন? বললেন, 'যদি সিংহের বাচ্চাটা ছেড়ে দাও তবে একটা সুন্দর খেলনা দেব।'

ভরত কি কথায় ভোলবার ছেলে? অমনি ছোট হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আগে খেলনা দাও?'

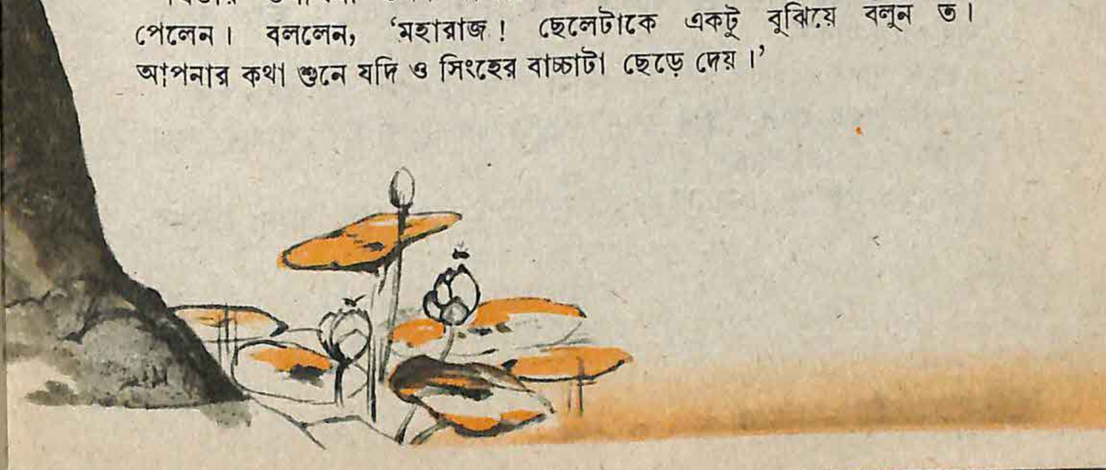
দুষ্যন্ত পাশে দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল ভরতের হাতের ওপর। একি! এর হাতের রেখায় দেখা যাচ্ছে এ চক্রবর্তী সম্রাট হবে। এ বালক আশ্রমে কোথা থেকে এল?





রাজা ভাবছেন আর ভাবছেন। একজন তপস্বিনী আরেক জনকে বললেন, 'খেলনার কথা বলে কোন লাভ হবে না। আশ্রমে একটা মাটির রঙিন ময়ুর আছে। আমি সেটা আনছি। এ সহজে ভোলবার ছেলে নয়।' তিনি আশ্রমে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় তপস্বিনী তখন রাজাকে দেখলেন। দেখে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। বললেন, 'মহারাজ! ছেলেটাকে একটু বুঝিয়ে বলুন ত। আপনার কথা শুনে যদি ও সিংহের বাচ্চাটা ছেড়ে দেয়।'



রাজা হেসে বললেন, 'আগে বলুন ত ছেলেটি কে? দেখে ত মনে হচ্ছে কোন রাজবংশের ছেলে হবে বুঝি। এ আশ্রমে কেমন করে এল?'

তপস্বিনী বললেন, 'আপনার অনুমান ঠিকই। ভরত পুরুবংশের রাজপুত্র।'

পুরুবংশের রাজপুত্র! দুষ্মন্তের মাথা যেন ঘুরতে লাগল।

ততক্ষণে প্রথম তপস্বিনী মাটির ময়ূর নিয়ে এসেছেন। ভরত যেই খেলনা নিতে হাত বাড়িয়েছে অমনি তিনি দেখলেন ভরতের হাতে রক্ষা-কবচটি নেই। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভরত! তোমার রক্ষাকবচ কোথায়? তুমি বড় দুষ্টুমি কর।'

তপস্বিনীদের সঙ্গে দুষ্মন্তও রক্ষাকবচ খুঁজতে লাগলেন। রক্ষাকবচটি মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, পাওয়া গেল। দুষ্মন্ত যেই সেটি তুলতে গেছেন তপস্বিনীরা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'থামুন! ওটা তুলবেন না!'

দুষ্মন্ত ততক্ষণে কবচটা তুলে নিয়েছেন।

তপস্বিনীরা ততক্ষণে কবচের কথা ভুলে বিস্ফারিত চোখে দুষ্মন্তকে দেখছেন। দুষ্মন্ত বললেন, 'কি হল? আপনারা এত ব্যস্ত হলেন কেন? নিন, কবচ নিন। ভরতের হাতে বেঁধে দিন।'

তপস্বিনীরা সম্বিত ফিরে পেলেন। বললেন, 'মারীচ ঋষি যখন এই রক্ষাকবচ ভরতের হাতে বেঁধে দেন তখন বলেছিলেন কখনো যদি কবচ পড়ে যায়, তাহলে ভরতের মা অথবা বাবা ছাড়া অন্য কেউ তাতে হাত দিলে কবচ সাপ হয়ে তাকে কামড়াবে।'

তপস্বিনীদের কথা শুনে দুষ্মন্ত বুঝলেন তার মন যা বলছে তা ঠিকই। ভরত তবে তাঁরই ছেলে। আনন্দে তাঁর চোখে জল ভরে এল।

ভরত ততক্ষণে সিংহের বাচ্চার কথা ভুলে গিয়েছে। ভরত বলল, 'মার কাছে যাব।'

দুষ্মন্ত আদর করে বললেন, 'চল সোনা আমরা দুজনেই মার কাছে যাই।'

অমনি ভরত বলল, 'তুমি কেন আমায় সোনা বলছ? আমার বাবা কে জান? রাজা দুষ্মন্ত।'

ভরতের সঙ্গে আশ্রমের দিকে যেতে যেতে একে একে রাজা দুষ্মন্তের



সব কথাই মনে এল। সেইদিনের কথা মনে পড়ল যেদিন শকুন্তলা দুষ্মন্তের সভায় এসেছিলেন অথচ দুষ্মন্ত তাঁকে চিনতে পারেন নি। কি যে হয়েছিল সেদিন! কেন যে ভুলে গিয়েছিলেন সব! কত কষ্টই পেয়ে শকুন্তলা রাজসভা থেকে চলে গিয়েছিলেন!

কিন্তু মারীচ ঋষির আশ্রমে কেন? পিতা কণ্বমুনির আশ্রমে কেন যান নি?

কণ্ব ঋষির আশ্রমেই দুষ্মন্ত প্রথম শকুন্তলাকে দেখেন।

দুষ্মন্ত শিকার করতে গিয়েছিলেন। একটি হরিণের পেছনে তাড়া করতে করতে আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হন দুষ্মন্ত। শকুন্তলা ও তাঁর সখীরা তখন আশ্রমের গাছে লতায় জল দিচ্ছেন। শকুন্তলার মত সর্বাঙ্গসুন্দর মেয়ে দুষ্মন্ত রাজপ্রাসাদেও দেখেন নি। তখনি দুষ্মন্ত ঠিক করেন শকুন্তলাকে রানি করবেন। কণ্ব সে সময়ে তীর্থে।

শকুন্তলারও দুষ্মন্তকে ভাল লাগল। আশ্রমেই দুজনের বিয়ে হল। কিছুদিন দুষ্মন্ত আশ্রমেই রইলেন। কিন্তু রাজার কত কাজ—সব ফেলে কি আশ্রমে বেশীদিন থাকতে পারেন? এদিকে কণ্বও তীর্থ থেকে আসেন নি—তাই শকুন্তলাকে যে নিয়ে যাবেন দুষ্মন্ত, সে উপায়ও নেই।

রাজাকে রাজধানী ফিরে যেতে হল। যাবার সময়ে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে নিজের আংটি দিলেন আর বললেন রাজধানী গিয়েই তিনি মন্ত্রী, সেনাপতি, লোকজন পাঠিয়ে শকুন্তলাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।

আশ্রমে একদিন দুর্বাসা মুনি এলেন। দুর্বাসা তাঁর ভয়ঙ্কর রাগের জন্যে বিখ্যাত। অতি সামান্য ত্রুটিতেই রেগে অগ্নিশর্মা হতেন দুর্বাসা আর ভয়ানক সব শাপ দিতেন।

দুর্বাসা যে এসেছেন, শকুন্তলা সে কথা জানেনই না। শকুন্তলা তখন বসে বসে দুষ্মন্তের কথা ভাবছেন আর ভাবছেন। দুর্বাসা রাগে কাঁপতে কাঁপতে শাপ দিলেন, 'যার কথা এত ভাবছ, সে তোমায় ভুলে যাবে।'

শকুন্তলার সে কথাও কানে গেল না। শকুন্তলার সখী প্রিয়ংবদা তখন দুর্বাসার পা ধরে অনেক কাকুতি মিনতি করলেন। দুর্বাসা বললেন, 'শাপ দিয়েছি, শাপ মিছে হবে না। তবে হ্যাঁ! শকুন্তলাকে রাজা যদি কোন



জিনিস দিয়ে থাকেন, তাহলে সে জিনিসটি দেখালে রাজা আবার সব মনে করতে পারবেন।'

দুর্বাসা ত চলে গেলেন। যা বলে গেলেন ঠিক তাই হল। কণ্বমুনি তীর্থ থেকে ফিরে এসে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের বিয়ের কথা শুনলেন। শুনে খুবই খুশি হলেন। শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের কাছে পাঠাবেন, তার ভাল সময় দেখতে লাগলেন।

আশ্রম, আশ্রমের মানুষজন, পিতা কণ্বকে ছেড়ে যেতে শকুন্তলার বড় কষ্ট হল। নিজের হাতে বোনা গাছ লতাকে জড়িয়ে কাঁদলেন তিনি, পোষা হরিণের কাছে বিদায় নিলেন। তারপর সকলকে কাঁদিয়ে নিজে কেঁদে দুজন ঋষি কুমারের সঙ্গে পতিগৃহে রওনা হয়ে গেলেন।

শকুন্তলা ঋষিকুমারদের সঙ্গে দুষ্মন্তের প্রাসাদে পৌঁছলেন। দুষ্মন্ত কিন্তু ওঁকে চিনতে পারলেন না। শকুন্তলা মুখ থেকে ঘোমটা সরালেন। রূপে চারদিক আলো হয়ে উঠল। তবুও রাজা ওঁকে চিনতে পারলেন না। শকুন্তলার ভারি দুঃখ হল। ভাবলেন আংটিটা দেখলে পরে রাজা ওঁকে চিনবেন। কিন্তু আঙুলের দিকে চেয়ে দেখেন—সর্বনাশ! আংটি ত আঙুলে নেই?

লজ্জায়-অপমানে শকুন্তলা রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। দুর্বাসার শাপের ফলেই যে রাজা ওঁকে ভুলে গেছেন সে কথা বুঝতে আর বাকি রইল না। ঋষিকুমাররা শকুন্তলাকে কণ্বের আশ্রমে নিয়ে যেতে চাইলেন কিন্তু শকুন্তলা রাজী হলেন না। অগত্যা, হেমকূট পাহাড়ে মারীচ ঋষির আশ্রমে শকুন্তলাকে রেখে ওঁরা ফিরে গেলেন।

শকুন্তলাকে রেখে যাবার পর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। দুষ্যন্তের রাজধানীতে একজন জেলে রাজার নাম লেখা আংটি বাজারে বেচতে গিয়ে ধরা পড়ল। সে বলল, 'আমি চোর নই। মাছের পেট থেকে এই আংটি বেরিয়েছে।' কেউ ত তার কথা বিশ্বাস করতে চায় না। শেষে সবাই জেলেকে দুষ্যন্তর সামনে ধরে আনল। রাজা আংটি দেখেই চিনতে পারলেন। এই আংটিই রাজা শকুন্তলাকে দিয়েছিলেন। দুষ্যন্তের কাছে আসার সময়ে গঙ্গা পেরোতে শকুন্তলা গঙ্গা প্রণাম করেছিলেন। তখনি

আঙুল থেকে আংটি খসে পড়ে যায়। একটা মাছ এসে সেটি খেয়ে নেয়।

রাজা ত রাতদিন ভাবতে লাগলেন। অনুতাপের সীমা-পরিসীমা রইল না যেন। শকুন্তলা যে কোথায় তাও ত জানেন না। শকুন্তলাকে খুঁজে পেতে এনে, অপরাধের ক্ষমা চেয়ে আদর করে প্রাসাদে না নিয়ে আসা পর্যন্ত



দুষ্যন্তের স্বস্তি রইল না। এই সময়েই দেবাসুরে যুদ্ধ লেগে গেল। ইন্দ্র দুষ্যন্তের সাহায্য চাইলেন। সেই যুদ্ধ থেকে ফেরবার সময়েই হেমকূট পাহাড়ে দুষ্যন্ত ভরতকে পেলেন।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে দুষ্যন্ত আশ্রমের দিকে চললেন। শকুন্তলা ভরতের খোঁজে এদিকেই আসছিলেন। রাজাকে দেখে শকুন্তলা থমকে দাঁড়ালেন। দুজনের চোখেই জল বইছে দেখে ভরত বললে, 'মা! এই লোকটা কে? আমায় সোনা বাছা বলছে?'

শকুন্তলা নিজেকে সামলে নিয়ে চোখ মুছে বললেন, 'এঁকে প্রণাম কর বাছা। ইনি তোমার বাবা।'

বাবা, মা, ছেলে সবাই গিয়ে মারীচ ঋষিকে প্রণাম করলেন। দুষ্যন্ত তাঁকে সব বলে কয়ে শকুন্তলা ও ভরতকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবার অনুমতি চাইলেন।

শুভদিনে শকুন্তলা ও ভরত আশ্রম থেকে বিদায় নিলেন। শকুন্তলার সেই কণ্বমুনির আশ্রম থেকে বিদায় নেবার কথা মনে পড়ল। সেটা ছিল কত দুঃখের দিন! কিন্তু আজকের দিনটি কি আনন্দের!

ভরতকে বিদায় দিতে আশ্রমবাসীদের চোখ জলে ভেসে গেল। ভরত আশ্রমে সকলের নয়নের মনি। আশ্রমের প্রাণ। মারীচ ভরতের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আজ বড় শুভদিন বাছা। আজ তুমি পিতার কাছে যাচ্ছ।'

মারীচ ঋষি দুষ্যন্তকে বললেন, 'মহারাজ! আপনার ছেলে খুব প্রতাপশালী পরাক্রান্ত হবে! দুষ্যন্তের ছেলে তার পিতার পরিচয়ে বিখ্যাত হবে না। আপনি ওর বাবা এই পরিচয়ে আপনিই বিখ্যাত হবেন। আমার ভবিষ্যৎবানী মিথ্যে হবে না। ঈশ্বর একে চিরায়ু করুন।'

বনের সীমান্ত অবধি এসে আশ্রমবাসীরা ওঁদের বিদায় দিয়ে গেল।

রাজধানীতে ওঁদের স্বাগত জানাতে আনন্দ উৎসব শুরু হল। নগরের তোরণে তোরণে মঙ্গলঘট, ঘরে ঘরে আলোর মালা, নাচগানের ধূম সারাদিন চলতে থাকল। রাজভাণ্ডারের দরজা খুলে দেওয়া হল। কোন প্রার্থী খালি হাতে ফিরল না। সারা রাজ্যে খুশির তরঙ্গ খেলতে লাগল।

ভরতের যেন নতুন জীবন সরু হল। দাসীরা ওকে সুগন্ধি জলে স্নান

করাল, রাজপুত্রের যোগ্য পোশাকে সাজাল। গলায় মুক্তোর মালা, মাথায় হীরের মুকুট আর কোমরে তরোয়াল পরিয়ে দিল। তপস্বী বালক ভরত তেজস্বী রাজপুত্র হয়ে গেল। ভরত কুলদেবতা, কুলগুরু ও পিতা-মাতাকে প্রণাম করল। তারপর বাবার সঙ্গে গিয়ে গম্ভীর চালে রাজসভায় বসল। দেখে কে বলবে এই প্রথম ও রাজসভা দেখছে। বাপ ছেলেকে একসঙ্গে দেখে প্রজাদের চোখ জুড়িয়ে গেল। স্বর্গ থেকে দেবতারা ফুল ফেললেন, আশীর্বাদ করলেন।

কয়েক বছর দুষ্যন্ত রাজত্ব করলেন। তারপর ভরত রাজা হন। সিংহ শিশু নিয়ে খেলতে খেলতে ভরত একদিন রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট হলেন। শোনা যায় ভরতের নামেই আমাদের এই দেশেটার নাম হয়েছে ভারতবর্ষ।

